রাণুর দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৫
পুনর্মুদ্রণ—আষাঢ় ১৩৪৮
পুনর্মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৫৩

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২৫. ৭. ৪৬

যাঁহারা 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এ এই নামের গল্পটি পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' জিনিসটা আকাশ-কুসুম। তবুও, শুধু নামের জের ধরিয়া রাখার জন্য বইটির এই নাম রাখা হইল। এটি আমার ব্যক্তিগত মোহ।

সমস্যারি দেশ। তাই 'দ্বিতীয় ভাগ' (বর্ণপরিচয়) হইতেই আমাদের কাছে সমস্যার উদয় হয়;—হাতে-খড়ি হিসাবে, বানানের আকারে। এখন পর্যন্ত ওই বইটাকে সবাই এড়াইয়া চলি।

সেইজন্য এটাও মুখপাতে বলিয়া রাখিতে চাই যে, 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর মতই 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ'ও সরল, ঋজু এবং সমস্যামুক্ত। বরং 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর একটা মিশন ছিল,—নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য-মত দেশের সমস্যামন্থর হাওয়াটাকে একটু হালকা করা। '—দ্বিতীয় ভাগ' যদি সে মিশনে সাহায্য করিতে পারে তো কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থকার

আমার অগ্রজ

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

করপদ্মে

"রাণুর দ্বিতীয় ভাগ"

সমর্পণ করিলাম

দ্বারবঙ্গ
অনন্তচতুর্দশী
১৩৪৫

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

দাঁতের আলো

১

আমার ভাইঝি "মৈয়া"র সম্প্রতি তিনটি দাঁত উঠিয়াছে, তাহাতেই তাহার নাকি মাটিতে পা পড়ে না! অবশ্য ঝিয়ের কোলে কোলেই কাটে, পা পড়িবার বয়স হয় নাই; তবে যাহারা বোঝে, তাহারা বলে, যদি বয়স হইতই, মাটিতে পা পড়িত না—এমনই দেমাক।

আমার সঙ্গে মা-ছেলের সম্বন্ধ; ডাকি, মৈয়া। কথাটা "মা"র মত কোমলও নয়, সরসও নয়। এ প্রান্তে ছোট ছোট পশ্চিমা শিশুরা "মৈয়া গে" বলিয়া আবদার ধরে। ও হইয়া অবধি কি জাদুবলে আমার বয়সের গোটা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ছাঁটিয়া দিয়া আমায় এই সব শিশুদের সামিল করিয়া দিয়াছে। আপিসে ইয়া-ইয়া জোয়ানদের উপর হুকুম চালাইয়া আপিস কাঁপাইয়া সন্ত্রস্ত করিয়া বাড়ির চৌকাঠ না ডিঙাইতে ডিঙাইতে আমি বদলাইয়া যাই। হাঁকি, মৈয়া, ভুখ লেগেছে বড্ড—

আমার বিশ্বাস, মৈয়া যে একজন মা, তাহা ওর বেশ স্পষ্টভাবে জানা আছে। ঝিয়ের কালোকুষ্টি কোলের মধ্যে সে ব্যস্ত হইয়া উঠে, রাখা দায়; ফুটফুটে হাত-পা, টুকটুকে মুখখানি চঞ্চল হইয়া উঠে—পঙ্কিল জলে বায়ু-চালিত পদ্মফুলটির মত। মৈয়ার ছেলে আসিয়াছে, তাহার ভুখ লাগিয়াছে, স্তন্য দিতে হইবে, আর কি সে থাকিতে পারে?

বলি, কোলে নাও মৈয়া।

সঙ্গে সঙ্গে কোলে লয়, বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবালের মত রাঙা ঠোঁটের মাঝখানে সেই তিনটি দাঁতের বিকাশ।

প্রশ্ন হইতে পারে, তিনটি দাঁত এমন কি ব্যাপার, যাহার জন্য এত ? বিজ্ঞমাত্রেই ওই কথাই বলিবে। উদাহরণস্বরূপ ওর বড় বোন রাণুর কথাই বলি। বলে, হ্যাঁ, বুঝতাম হাতী হয়েছে, ঘোড়া হয়েছে, মোটরকার হয়েছে, দেমাকও হয়েছে। তিনটি দাঁত এমন কি সম্পত্তি, মেজকা, যে, মৈয়ার তোমার ঠ্যাকার রাখতে জায়গা নেই ? আমি তো বুঝি না বাপু।

বলি, একেবারে ঠ্যাকার হয়ে গেল রাণু ?

হ্যাঁ, ঠ্যাকার বইকি। তোমার মৈয়াকে নিয়ে কিছু বললেই তোমার লাগে ; কিন্তু দাঁত হয়ে পর্যন্ত যা সব কাণ্ড, তা দেখে ঠ্যাকার বলব না তো বলব কি ? উনি আজকাল দুধ খাবেন না। দুধ খেতে যাব কেন ? ওতে কি দাঁতের দরকার হয় ? আমি খাব কয়লা, চায়ের কাপ, খোলামকুচি, দাদুর খড়ম, কুটকুট ক'রে শব্দ হবে, লোকে বলবে, হ্যাঁ, ছবুরাণীর দাঁত হয়েছে। অথচ পুঁজি তো সবে তিনটি। আর গজর গজর ক'রে বকেই বা কেন এত ? বড় যে মৈয়াকে তোমার চেনো, অত বকবার মতলবটা কি বল দিকিন ?

রাণুকে এই তালে শিশুতত্ত্ব শিখাইবার লোভটা সংবরণ করিতে পারি না, বলি, ওটা আপনা আপনিই হয় রাণু, বকবার জন্যে ওকে বড় একটা চেষ্টা করতে হয় না। ইংরিজীতে একে অটোমেটিক অ্যাক্‌শন বলে, আর একটু বড় হ'লে তোমায় এসব বুঝিয়ে দোব 'খন। ওর দ্বারা ওদের জিবের এক্‌সার্‌সাইজ হয়, তারপর ক্রমে—

রাণু হাসিয়া বলে, তুমি কিছুই ধরতে পার নি মেজকা। তোমরা মায়ে পোয়ে ঠিক এক রকম, কি যে কতকগুলো আউড়ে গেলে ! ছবিরাণীর কথায় আবার ইংরিজী এল কোত্থেকে বুঝতে পারি না। না জান তো আমার কাছে শোন। বকে, কি না দাঁত তিনটি ঝিকমিক

করবে; না হ'লে কথায় মাথা নেই মুণ্ডু নেই, অত আবোল-তাবোল বকতে যাবে কেন বল তো?

আমি অজ্ঞতার নীরব হাসি হাসিয়া কথাটা জানিয়া লই।

প্রকৃত তত্ত্বটা বুঝিতে পারিতেছি দেখিয়া রাণু আবার প্রশ্ন করে, দাঁতে দাঁত দিয়ে এক-একবার ঘষে কেন বলতে পার, কুর-র কুর-র ক'রে শব্দ ক'রে?

বলি, তিনটি দাঁত ঝিকমিক করবে ব'লে।

রাণু ধমক দিয়া উঠে, বাস্, এইবার ওই এক কথাই চলবে, ঝিকমিক করবে ব'লে; দাঁতের ওর যেন আর অন্য কাজ নেই। দাঁত ঘষবার আর কোন হেতু নেই, শুধু কখন কুট ক'রে কামড় দিতে হবে, তার জন্যে ঘ'ষে মেজে তোয়ের ক'রে রাখা; ওকে তুমি কম মানুষটি মনে কর নাকি? একবার যদি বাগিয়ে ধরতে পারলে তো তিনটি ছাপ না দিয়ে ছাড়বে না। আমি বাঘের মুখে হাত দিতে রাজি আছি, কিন্তু ও মেয়ের কাছ থেকে একেবারে সাত হাত তফাতে থাকব, এই ব'লে দিলাম তোমায়।

সাত হাতের প্রতিজ্ঞা সাত মিনিটও টিকে না। হাসিতে মুক্তাবৃষ্টি করিতে করিতে মৈয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই ঝিয়ের কোল, সেই রাঙা ঠোঁটে বাঁধানো তিনটি দাঁত, কিন্তু এত পরিচয়েও এতটুকু পুরানো নয়।

রাণু গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, ঝিয়ের কোল হইতে যেন ডাকাতি করিয়া কাড়িয়া লয়। হাসিতে গৌরবে একশা হইয়া বলে, দেখ মেজকা, দেখ, কি চমৎকার মানায় হাসলে!

মৈয়ার দাঁতে আঙুল টিপিয়া বলে, আর কতটুকু দাঁত মেজকা, কুরকুর ক'রে হাতে ঠেকে এমন চমৎকার!

ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি বলি, হাত দিও না, দেবে এক্ষুনি কামড়ে রক্তপাত ক'রে।

হ্যাঃ, তোমার যেমন কথা, ছবুরাণী আবার নাকি কামড়ায়! ক্ষীরে ঠেকলে দাঁতগুলি ভেঙে যাবে, এত নরম। তোমরা সবাই আমার ছবুরাণীর একটা বদনাম তুলে দিয়েছ, এতে যে তোমরা কি সুখ পাও! কি ছেলে তোমার ছবিরাণী, শুধু মায়ের নিন্দে, কি ছেলে তোমার?

রাণু শেষের কথাগুলা মাথার একটা ঝাঁকানির সঙ্গে কপট গাম্ভীর্যে ও হাসিতে মিলাইয়া এমনভাবে বলে যে, মেয়া হঠাৎ হাসিতে একেবারে কুটিকুটি হইয়া পড়ে। তিনটি দাঁতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতে থাকে, কচি শরীরের কূল ছাপাইয়া লহর উঠে। থামিবার অবসর পায় না, থামিলেই রাণু সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিয়া দেয়, হাসির স্রোত দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে ঝাঁপাইয়া যেন চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে।

২

বাড়ির নবীনতম সংবাদ—কাল বাবুলবাবুর শুভাগমন হইয়াছে, জন্মস্থান পূর্ণিয়া, বয়স ছয় মাস।

মানুষটি গম্ভীর প্রকৃতির। কপালটি প্রশস্ত হওয়ায় এবং মাথায় চুলের ভাগ অল্প হওয়ায় ভাবটি যেন একটু মুরুব্বি-গোছের। আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া, পাতলা ঠোঁট দুইটি চাপিয়া শান্তভাবে সংসারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং রহিয়া রহিয়া, অনেকক্ষণ পরে পরে, সমস্ত শরীরটি দোলাইয়া এক-একবার উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠেন; দেখিলে মনে হয়, হঠাৎ যেন জগৎ-বিধানের কোন গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

সিমলায় বাণিজ্য-বৈঠকে জাপানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কি রফা হইল দেখিতেছিলাম, রাণু আসিয়া একটি গুরুতর সমস্যা হাজির করিল, বলিল, আচ্ছা মেজকা, আমরা বড়রা ভাবি, কচি ছেলেমেয়েরা সুন্দর হয় ভাল চুল হ'লে, ভাল চোখ হ'লে, মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস হ'লে, এই তো? কিন্তু ওরা নিজেরা কি ভাবে বল তো?

এই রকম কোন প্রশ্ন উপস্থিত করিলে আমি রাণুর কাছে একটু ভয়ে ভয়েই উত্তর দিই; কারণ, ও যেমন এক দিকে শিশুদেরও শিশু বলিয়া জানে, অপর দিকে আমাকেও একটি শিশুবিশেষ বলিয়া ধরিয়া লয়। তবুও বলিলাম, ওদের সুন্দর কুৎসিত সম্বন্ধে কি কোন ধারণা আছে রাণু? ও ধারণাটা জন্মাতে অনেক দেরি লাগে, বিশেষ ক'রে নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে। সব-প্রথমে ওদের জ্ঞান হয় খাওয়া নিয়ে— তোমায় একদিন বুঝিয়ে দোব যে, সেটা আত্মরক্ষা অর্থাৎ নিজেকে বাঁচাবার যে ইচ্ছে, ইংরেজীতে যাকে বলে—

রাণু হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, তুমি যখন ওই রকম ক'রে কি সব ব'লে যাও, আমার এত মিষ্টি লাগে মেজকা; ফুরসৎ থাকলে ব'সে ব'সে শুনতে ইচ্ছে করে। ছেলেরা নিজেদের কিচ্ছু জানে না, যত জান তুমি। কোন্ দিন ব'লে বসবে, ওই চিলটা যে উড়ে যাচ্ছে, তা ও নিজে জানে না। ওমা! শঙ্খচিল! প্রণাম কর মেজকা, মাথায় বুদ্ধি দেন। ওমা! শঙ্খচিলকে বুঝি ওই রকম ক'রে প্রণাম করে? হাত দুটো একত্তর ক'রে এই রকম শাঁখের মত কর। হয় নি ও। হ্যাঁ, এইবার হয়েছে! অথচ বললেন, ওঁর মতন কেউ কিচ্ছু জানে না। হ্যাঁ, কি যে বলছিলাম, আমরা ভাবি, চোখে চুলে রঙে ছেলেরা সুন্দর হয়; ওরা কিন্তু ভাবে, দাঁত যদি না রইল তো কিছুই নয়। হ্যাঁ মেজকা, ঠিক। আমি ভেবে সারা, বাবুল সর্বদা অমন ঠোঁট বুজে থাকে কেন, একটু ফিক

ক'রে হাসলেও কখনও যদি, অমনই টপ ক'রে ঠোঁট বুজে ফেললে। কোন হদিস পাই না। তারপরে বুঝতে পারলাম, আহা, বেচারীর একটি মাঝের দাঁত ব'লে এত লজ্জা গো, আহা! তার ওপর দাদু যখন একদন্ত, হেরম্ব, লম্বোদর, গজানন ব'লে ঠাট্টা করেন, ও বেচারীর যেন মনে হয়, মা পৃথিবী, দ্বিধে হও, আর কত সইতে হবে! আহা, না বিশ্বাস হয়, এই দেখ।

ছুটিয়া গিয়া বাবুলকে লইয়া আসে—আদর করিতে করিতে এবং আদরের অধিক আশ্বাস দিতে দিতে, না জাদু, তোমায়, কেউ ঠাট্টা করতে পারবে না, চল তুমি, আমার সোনার মত একটি দাঁত কার আছে গো?

কাছে আসিয়া বলে, দেখি কেমন দাঁত, হাঁ কর তো জাদু আমার, বড় লক্ষ্মী ছেলে গো, বাবুলের মত লক্ষ্মী ছেলে— কর তো হাঁ।

বাবুল অল্প একটু হাসির সহিত মুখটা গোঁজ করিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরে, কোনমতেই ঠোঁট খুলিবে না। একটা খেলা চলিতে থাকে, রাণু গাল দুইটি টিপিয়া ধরে, আঙুলের মধ্যে ঠোঁট দুইটি জড়ো করিয়া ধরে, চুমা খায়, শেষে কৃত্রিম রোষে ধমক দেয় পর্যন্ত; অবশেষে বিজয়িনীর ভঙ্গীতে আমার দিকে চাহিয়া বলে, দেখলে তো? একটা গোটা রাজ্যি দিলেও হাঁ করবে না। আর তাও বলি মেজকা, দোষই বা দোব কি ক'রে? কেউ কি নিজের খুঁত নিজে দেখাতে চায় মেজকা, তুমিই বল?

বাবুলকে বুকে চাপিয়া দোল দেয় খানিকটা, তারপর বলে, ওদিকে তোমার মৈয়ার গুমর তিনটি দাঁত ব'লে, আর এদিকে বাবুলবাবুর লজ্জা একটি দাঁত নিয়ে; তা হ'লে আর কি সন্দেহ রইল মেজকা যে, কচ্ছেলেরা নিশ্চয় ভাবে, দাঁত নিয়েই তাদের যা কিছু বাহার?

হাতে আপাতত একটা দরকারী কাজ ছিল, অব্যাহতি পাইবার জন্য হাসিয়া বলিলাম, না, আর মোটেই সন্দেহ রইল না।

অভিমতটা যে রহস্যমাত্র, রাণুর মত মেয়ে তাহা না বুঝিয়াই পারে না; মুখটা একটু ভার করিয়া কহিল, বেশ, ক'রো না বিশ্বাস; নিজেই সব জান যথন—

বাবুলকে লইয়া চলিয়া গেল। জানি, ও হারিবার পাত্রী নয়। এর পরে আরও গুরুতর প্রমাণ লইয়া হাজির হইবে, তখন ধীরে-সুস্থে ওকে বিশ্বাস করাইয়া ওর থিওরিটা মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট করা যাইবে। কাজের তাগিদে সে সময়টা অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছিল।

৩

দিন দশেক হইল কর্মস্থানে আসিয়াছি। যতক্ষণ কাজের ভিড়ে থাকি, এক রকম কাটিয়া যায়। তাহার পর নিষ্কর্মতার সুপ্রচুর অবসরের মধ্যে মনটা যেন হাঁপাইয়া উঠে, দূরত্বের সমস্ত ব্যবধান ডিঙাইয়া বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-ছায়ায় ব্যাকুল অনুসন্ধান চলিতে থাকে। উঠানের মাঝখানে যেন কোথা হইতে অনেকক্ষণ পরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ডাকিলাম, মৈয়া কোথায় গা? ঘরের ছায়ার মধ্যে যেন খানিকটা আলো ফুটিয়া উঠে, মৈয়াকে কোলে লইয়া মুখে মুখ চাপিয়া রাণু বাহির হইল, ও ছবু, তোমার ছেলে ডেকে ডেকে খুন হ'ল, আর তুমি কিনা দিব্যি— এ কেমনতর মা বাপু!

বিদ্যুৎ-রেখার মত মৈয়া কোলে ঝাঁকিয়া পড়ে, ও আর থাকিবে না, কতক্ষণ পরে ছেলে আসিয়াছে। দৃশ্যটা মিলাইয়া যায়। স্মৃতি-মঞ্চে বাবুলের আবির্ভাব। গম্ভীর, নতদৃষ্টি; নিজের পায়ের বুড়া আঙুলটা ভক্ষণ করিতে হইলে মাথাটা নামাইয়া আনা দরকার, কি পাটা

তুলিয়া ধরা দরকার, সে সমস্যা মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না, উভয় রকম পরীক্ষাই চলিতেছে। মৈয়া আমার কোল হইতে ঝিয়ের কোলে যাইবে না, এক-একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখে আর প্রবল আপত্তিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরে। হঠাৎ সব মিলাইয়া যায়, যতই বেশি চেষ্টা করি, ততই সমস্তকে আড়াল করিয়া আমার বাসার সামনের তালগাছ দুইটার নির্মম রুক্ষতা স্পষ্ট হইয়া উঠে, কোন্ পথে যে মনটা বাড়ি গিয়া উঠিয়াছিল, কোনমতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি না।

বাড়ি হইতে চিঠি আসিয়াছে, প্রয়োজনীয় খবর এক-একটি করিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু নব প্রবাসীর মন যে সব অপ্রয়োজনীয় খবরের জন্য বেশি কাতর, তাহার বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ নাই।

কয়েকদিন এইভাবেই কাটিল। মনটা নিজের নির্জীবতায় ক্রমেই ভারী হইয়া কর্মের স্রোতে তলাইয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়, একদিন ডাকপিওন আপিসের চিঠি আর তিনখানা আমার নিজের চিঠি দিয়া একটা আকণ্ঠ ঢাকা সবুজ লেফাফা বাহির করিল। বলিল, দেখুন তো বাবু, এটা কি আপনার চিঠি? একেবারে আণ্ডার্‌পেড, না আছে পুরো ঠিকানা, না আছে কিছু, শুধু বাংলা অক্ষর দেখে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, এখানে বাঙালী তো এক আপনিই আছেন, দেখি জিজ্ঞেস ক'রে।

প্রথমটা লইতে চাহিলাম না। ডাক-বিভাগের দয়ায় এক আনার কন্‌সেশন টিকিট হওয়া পর্যন্ত রোজই গড়ে তিন-চারটা করিয়া পয়সা দণ্ড দিতে হইতেছে। একটা খাম ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অন্যমনস্কভাবেই বলিলাম, না, ফেরত দিগে।

পিওন একটু দূরে গেলে কেমন একটা কৌতূহল হইল। ঠিকানা

নাই, কিছু নাই, এ আবার কেমনধারা চিঠি! একবার দেখিতে হয় তো! ডাক দিয়া ফিরাইলাম।

ঠিকানাটা পড়িয়া হাসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, আমার চিঠিই বটে। পকেট হইতে আড়াই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। রাণুর চিঠি; ঠিকানার মধ্যে শুধু ছোট বড় অক্ষরে 'মেজ-কাকা'; আর রাণুর নিজের ব্যাকরণের পদ্ধতিতে গ্রামের নামটা। শহরের পোস্ট-আপিসের কোন বাঙালী কেরানী সেটাকে লাল কালিতে ইংরেজীতে লিখিয়া দিয়াছে। গ্রাম আর পোস্ট-আপিস একই হওয়ায় চিঠিটা আসিয়া নির্বিঘ্নে পৌছিয়াছে।

অন্য পত্র ছাড়িয়া আগ্রহের সহিত রাণুর পত্রই আগে খুলিয়া ফেলিলাম। হাতের লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া, বড় বড় রুল টানা চারখানা পাতায় ঠাসা লেখা একখানি বৃহৎ লিপি। যথাযথ তুলিয়া দিলে সকলের বোধগম্য হইবে না বলিয়া বানান প্রভৃতি একটু আধটু পরিবর্তিত করিয়া দিলাম।

মেজকা, তোমার আর সব ভাল, কিন্তু টপ ক'রে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাও না ওই এক কেমন রোগ। কচি ছেলেরা যদি দাঁত সব্বার চেয়ে ভাল না ভাববে তো ছবুরাণী অমন ক'রে কথায় কথায় হাসতে যাবে কেন, আর বাবুলই বা মুখটি বুজে থাকবে কেন? বেশ, আমার কথাটা না হয় মিথ্যে, কিন্তু সেদিন যে কাণ্ডটা হ'ল, তা কিসের জন্যে বল তো? দাদু বাইরে যান নি, সমস্ত দিন বেচারীকে ক্ষেপিয়েছেন, একদন্ত গজানন একদন্ত গজানন ব'লে। সমস্ত দিন মুখটি চুন, কিছু খাবে না, শুধু বায়না আর বায়না। সন্ধ্যের পরে কাকীমা বললেন, বড্ড গরমে ছেলেগুলো সেদ্ধ হচ্ছে রাণু, চল, ছাতে নিয়ে যাই। কাকীমা, আমি, ছবি, ছোটকাকা আর বাবুল। জোছনা ফুটফুট

করছে, আর তেমনই হাওয়া। আমি বললুম, মিথ্যে বল নি কাকীমা। তোমার মৈয়া তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ল। উনি একটু আবার আয়েসী কিনা।

মাতুরে শুইয়ে দিলাম। কি যে সুন্দর দেখাচ্ছিল, তা যদি দেখতে মেজকা! মুখটি একটু ফাঁক হয়ে গেছে। চাঁদের চেয়েও সাদা তিনটি দাঁত, বলে, চাঁদ ফেলে আমায় দেখ। ছোটকাকা বললে, চল বউদি, আলসের ওপর বসি, খুব হাওয়া লাগবে, অত চেপে-মারা পর্দা মানি না। বাবুলকে ছবুরাণুর কাছে ঝুমঝুমিটা দিয়ে বসিয়ে ওদিকে আলসের ওপর উঠে বসলাম। বসবে কি লোকে ছাই, তার কি জো আছে? ছেলে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে সবাই দেখি, চোরের তিনটি আঙুল জাঁতি-কলে আটকে রয়েছে। দাঁত যে উপড়ে ফেলা যায় না, সে আর ও ছেলেমানুষ কি ক'রে জানবে বল? ভাবলে, দাঁতের গেরস্ত ঘুমুচ্ছে, এই ফাঁকতালে একটা চুরি ক'রে নিই। আমার তা হ'লে দুটি হবে দিব্যিটি। শয়তানিটা বোঝ একবার। এদিকে গেরস্ত ছবিরাণী যে কি হুঁশিয়ার মেয়ে, তা তো আর জানেন না বাবু। না বিশ্বাস হয়, দাতুকে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠিও। তিনিই তো বললেন, এ ডাহা চুরির চেষ্টা।

আহা মেজকাকা, লজ্জানিবারণ হরি সত্যিই সব দেখতে পান। বললেন, হ্যাঁ, তোর দাঁতের জন্যে এত হেনস্তা? র'স্। তার পরদিন বাবুলের জর, পেটের অসুখ, ছেলে যেন নেতিয়ে পড়ল। বললে পেত্যয় যাবে না, তার পরের পরদিন নীচে একটি দাঁত! আমিই প্রথমে দেখে সবাইকে বললাম। বাবুল আর সে বাবুল নেই মেজকাকা। কথায় কথায় হাসি, কথায় কথায় হাসি, আর কি দুরন্ত! ছবুরাণীর মত আর একটি দাঁত হ'লে ও ছেলে যে কি করবে ভেবে পাই না।

পাঁচটি কচি দাঁতের হাসিতে বাড়ি একেবারে আলো ক'রে রেখেছে মেজকাকা। কি সে চমৎকার, না দেখলে পেত্যয় যাবে না। তুমি শিগগির একবার ছুটি নিয়ে এস। সায়েবকে সব কথা খুলে বললেই ছুটি দিয়ে দেবে। তাদেরও কচি ছেলে আছে তো; আর তাদেরও তো এই রকম একটি দুটি ক'রে দাঁত ওঠে!

আজ উনিশ দিন ধরিয়া এই চিঠিরই প্রতীক্ষা করিয়াছি। এর অযথা কাকলি আমায় এক মুহূর্তেই আবার বাড়িতে আমার নিজের জায়গাটিতে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল; সেখানে গম্ভীর সাংসারিকতার বাহিরে মৈয়া, বাবুল, রাণু আর ওদের দলের যত সব অকেজোরা দিবারাত্র তাহাদের অর্থহীন খেয়াল-খুশির স্রোত বহাইয়া চলিয়াছে।

মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক পড়িয়া রহিল। সেগুলা সহকারীর ওখানে পাঠাইয়া দিতে হইবে, আপাতত সাহেবের নিকট দুইটা দিনের ছুটি লইতে হয়। শেফালি-স্তবকের মত রাঙায় সাদায় আলো-করা দুইটি কচি মুখের হাসি আমায় প্রবল আকর্ষণে টানিতেছে।

বরযাত্রী

১

ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ঘোঁৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গণশার অপেক্ষা; সে আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন সাজ-গোজের মধ্যে এর পূর্বেও আসিয়া কয়েকবার খোঁজ লইয়া গিয়াছে, আবার তর্জনীর ডগায় একটু স্নো লইয়া মুখ বাঁকাইয়া দক্ষিণ গালটা নির্মমভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল; প্রশ্ন করিল, এল র‍্যা?

ঘোঁৎনা বলিল, ওর মামা ওকে যে রকম আগলে ব'সে আছে দেখলাম—

এমন সময় হালদারদের বাড়ির পাশের গলিটায় সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ হইল, এবং গণশা সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং সবেগেই দলটির মাঝখানে প্রবেশ করিয়া ব্রেক চাপিয়া নামিয়া পড়িল। জবাবদিহি হিসাবে বলিল, গ-গ্ গণশাকে আটকায় সে এখনও মা-ম্মায়ের পেটে।

ছোকরা একটু তোতলা; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে এক-একটা অক্ষর প্রায়ই দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। ডান দিকের ভ্রূটায় একটা হেঁচকা টান দিয়া সামলাইয়া লয়।

রাজেন বলিল, তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হ'ত গণশা। এতদিন হাঁটাহাঁটি ক'রে সাহেব যদি বা ইণ্টার্‌ভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্র যাওয়ার লোভে—

ঘোঁৎনা বলিল, তাতে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার!

গণশা বলিল, তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এর পর আমার

নি-ন্নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গ্‌গণশা, তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ কর্‌গে।

গণেশের কথাটা বলিবার হক আছে। সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করাইয়া তাহাকে সকল দিক দিয়া লায়েক করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। আপাতত এ কয়েকদিন ধরিয়া দাম্পত্য-নীতিতে জোর তালিম দিতেছে সেই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-রাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্বে বাসর-দুর্গটি কি করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও কৌশল-কানুন অধিগত করা হইতেছে ওই গণশারই নিকট।

ত্রিলোচন কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, না না, এসে ভালই করেছিস। বউদি আবার বাসরঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে, ভাবছি আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আর জল খাচ্ছি। যার সঙ্গে বিয়ে, সে একলাটি থাকলেই দিব্যিটি হ'ত। কার কথার যে কি উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফজোড়াটা নেড়ে দেবে, তার ওপর আবার গানের ফরমাশ আছে, কারুর হেঁয়ালি আছে।

কে. গুপ্ত ত্রিলোচনের পাশাপাশি তাহাদের ফুটবল-টীমে ব্যাক খেলে। বলিল, তা বটে; পাঁচটা ফর্‌ওয়ার্ডকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়—

ত্রিলোচন বলিল, ছ জনে মিলে, আর এ একলা। গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গণশা, যতটা হালকা হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন—

গোরাচাঁদ বলিল, তা হ'লে তো নাক কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।

গণশা বলিল, বরং ক-কন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয়। দেখবে, বরের গ-গ্‌লারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে।

ত্রিলোচন চিন্তিতভাবে বলিল, তোদের তামাশা ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এদিকে যে কি হচ্ছে তা—। আবার তার ওপর সকাল সকাল লগ্ন প'ড়ে গেছে কপালগুণে।

কে. গুপ্ত বলিল, খুব স্টেডি থাকবেন মশাই, নার্ভাস হ'লেই প্রেস ক'রে ধরবে। একটা বড় দেখে নিতবর সঙ্গে নিলে—

গণশা একটু রাগিয়া উঠিল; বলিল, বা-ব্বাড়ির দারোয়ান কি গা-গ্‌গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না মশাই; সে সব আপনাদের ছা-চ্ছাতুর দেশে চলে।

বেহারের ছেলে। সুদূর ছাপরার এক মহকুমার স্কুল হইতে পাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, বাংলার ছেলেদের সঙ্গে এখনও কথায় পারিয়া উঠে না। কে. গুপ্ত চুপ করিয়া গেল।

ঘোঁৎনা বলিল, বাসরঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ি চড়াও ছাড়তে হয়।

গোরাচাঁদের কথাবার্তায় প্রায়ই একটু আহার্যের গন্ধ থাকা নিয়ম; বলিল, তা হ'লে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।

কবি রাজেন বলিল, কণ্টকের ভয়ে গোলাপফুল ছাড়তে হয়।

গণশা সাইকেলটা রাখিতে গিয়াছিল, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বরযাত্রীদের মালা এসেছে?

ত্রিলোচন বলিল, সে সব ঠিক আছে—মালা, গোলাপজল, এসেন্স। আর—আমি যাই, দেখিগে, সবাই একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাবি তো?

গোরাচাঁদ বলিল, হঁ্যা, যা, শিগগির যা। কি কি আছে র‍্যা?

ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া ঘোঁৎনা বলিল, আর শোন্। ওদিকে কে কে যাচ্ছে বল্ তো, বেশি ভেজাল বাড়লে আবার ফুর্তি জমবে না।

ত্রিলোচন বাঁ হাতের আঙুলের পর্ব গুনিতে গুনিতে বলিল, বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু, এই হ'ল চার, আর আর—

বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কে. গুপ্ত ভয়ে ভয়ে মনে করাইয়া দিল, একজন পুরুত যাবে না?

ত্রিলোচন গুনিল, পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুত-মশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্ন মশাই যাবেন।

গোরাচাঁদ একটু অস্বস্তির সহিত বলিল, এই ছজনেও মিষ্টিমুখ করবে তো?

ঘোঁৎনা বলিল, পুরুত-ঠাকুরের কাকা? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!

ত্রিলোচন বলিল, তাকে দীনে সামলাবে।

রাজেন বলিল, একা দীনে ব্যাটা কজনকে সামলাবে? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্জের যাওয়া মানেই বোতলের শ্রাদ্ধ।

ত্রিলোচন বলিল, সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই চ'লে আসবে; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল? দু পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দু ডজন চপ কাট্‌লেট—

গোরাচাঁদ বিরক্ত হইয়া বলিল, কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্ছিস সবাই? সাজগোজে দেরি হয়ে যাবে, ভাল ক'রে একটু সাজতে হবে তো? কথায় বলে বরসজ্জা। ওই সঙ্গে কিছু চপ কাট্‌লেট সরিয়া ফেলগে তিলোচন, ট্রেনে কাজ দেবে।

উপর হইতে ছোট বোন ডাকিল, দাদা, গল্প করছ, জামাকাপড় পরতে হবে না? বউদি চন্দন-টন্দন নিয়ে ব'সে আছেন যে!

গোরাচাঁদই উত্তর দিল, তোদের সব তাড়াতাড়ি। ত্রিলোচনের গেঞ্জিতে একটা টান দিয়া বলিল, আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি, দেখে শুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মার মনে আবার শুভদিনে একটা খটকা থেকে যাবে। ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস নি, আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গণশা?

গণশা বলিল, তা বইকি, আজকাল যত—

ত্রিলোচন পা বাড়াইল। গণশা হঠাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, মা-মালা, গোলাপজল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমার জন্যে একটা সিল্কের রুমাল আর ভা-ভাল শাল পারিস তো, পা-প্পালিয়ে এসেছি কিনা; আর দেখ—

ত্রিলোচন দরজার নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইতে গণশা বাঁ হাতটা তুলিয়া সিগারেটের টিন আঁটে এই পরিমাণ একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল, বা-ব্বাগাবি একটা।

উত্তরে ত্রিলোচন বাঁ হাতের তর্জনী-আর মধ্যমা আঙুল দুইটা তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, সে হয়ে গেছে—এই।

গণশা বিরক্ত হইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল, বে-ব্বেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করাবার সময় করবে? খ্যাটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে। আমায় আবার সা-স্সাক্ষী মানতে কে বলেছিল র‍্যা? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই, না রে গণশা?

যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূল নাম গোকুলপুর ; পরে 'কালসিটে গোকুলপুরে' দাঁড়ায়। কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু কালসিটেতে দাঁড়াইয়াছে।

বরযাত্রীর দলও প্রায় গোরার মতই শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোন বরযাত্র আসিলেই ছেলে-ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়, এ যার নাম কালসিটে মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।

গ্রামটা ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি, স্টেশন হইতে মাইল তিন-চার দূরে।

বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের সব বাড়িই এই রকম। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে খানা-ডোবা ; দুই-একটা মাঝারি-সাইজের পুকুরও আছে, সব জলে টইটুম্বুর। জলটা ঘাটের কাছে একটু দেখা যায়, তাহার পরই ঘন সতেজ পানার কার্পেট।

সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রশি দুয়েকের তফাত হইবে। উৎসব উপলক্ষ্যে সদর-বাড়ির সমনে একটি ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানার চারিদিকে খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো, মাঝখানে একটি তীব্রজ্যোতি গ্যাসের আলো—বকমধ্যে হংস যথা শোভা পাইতেছে। অন্দর-বাহির মিলিয়া আরও গোটা-কতক গ্যাসের আলো।

শামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতেছে দেখিলেই বাসরঘর স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, বাপ রে, দফা সারলে আজ!

তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বন্ধুবর্গ। সবচেয়ে কাছে গণশা, একটা মখমলের বালিশ বুকে চাপিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনও মুখটা বাড়াইয়া আনিতেছে, এবং একটু কথাবার্তা হইতেছে।

একটু দূরে কর্তারা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ—কম-বেশি করিয়া। সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য, তিনি কতশত জায়গায় বরযাত্র গিয়াছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানা রকম উদাহরণ দিয়া অশেষ প্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুশকিল, তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর; বরপক্ষীয়েরাই বরং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ, এ গ্রামে এ রকম বরযাত্রী আসে নাই।

কথাটা অমায়িক মৃদু হাস্যে, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় আরম্ভ হইয়াছিল; ক্রমেই কিন্তু সে ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা জেদাজেদির সঙ্গে সবার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উষ্ণ হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মত ভদ্রলোক দেখি নি, তা কোনমতেই মানবেন না? ভারী জ্বালা তো!

ওদিককার একজন তাঁহারই মত ভারী আওয়াজে উত্তর করিল, আর আমাদের কথাটা বুঝি কিছু নয় তা হ'লে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী হলাম?

ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রামবাবুর আত্মসম্মান

ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন, কটা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুনে দিন তো দেখি, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দিতে যান।

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার উচ্চারণ আরও বেশি গাঢ় এবং অস্পষ্ট।

পিছন হইতে একটা ছোকরা শাসাইল, এটা কলসিটে মশাই, মনে থাকে যেন।

একটা বাড়াবাড়ি রকম কিছু হইতে যাইতেছিল, কন্যাবাড়ির লোকেরা এবং কয়েকজন বয়স্থ লোক আসিয়া তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিল। সহায়রামবাবু আর ত্রিলোচনের পিসেকে ধরিয়া সদর-বাড়ির ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং ওদিককার কয়েকজনকেও সরাইয়া আসরের নিদারুণ ভদ্রাভদ্র সমস্যাটা কতক হালকা করিল।

রাজেন তাহার নিজের লেখা কবিতা বিলি করিতে যাইতেছিল। ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল, কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল, এই, সব খেপে রয়েছে, এখন আর ঘাঁটাস নি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে, ঠাট্টা করছে।

রাজেন ক্ষুণ্ণমনে বলিল, তা হ'লে এগুলো কি হবে? এত কষ্ট ক'রে লিখলাম, ছাপালাম, কেউ পড়বে না?

গোরাচাঁদ আশ্বাস দিল, ভাবিস নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব 'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার সন্ন্যাসীপ্রদত্ত দক্রভৈরবের হ্যাণ্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা ক'রে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস'ও দিয়ে দেবে।

রাজেন কোন উত্তর দিল না, নাক মুখ কুঞ্চিত করিয়া পদ্যের বাণ্ডিলটা হাতের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

ত্রিলোচন ভীতভাবে গণশার দিকে মুখটা সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, দেখলি তো পিসে আর সহায়রামবাবুর কাণ্ডটা? ওদের আর কি? ওরা দুজনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে, সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভাবটা বুঝছিস তো? ব্যাটারা বাড়িতে মেয়েদের সব খবর দিতে গেল, আসরের শোধ বাসরে তুলবে। আঃ, গোলমালে আবার গানের অন্তরাটা দিলে ভুলিয়ে। তারপর কি র‍্যা গণশা, মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি? একটু মাথাটা সরিয়ে আন্, সুর ক'রেই বল্।

গণশা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাবব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি
চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, এই গাঁটের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল—

ব্যাকুল হোয়,
নয়না নিদ জানত নেহি,
মানত নেহি

গণশা গাহিতেছিল—

জা-জ্বা-জ্বানত নে-ন্নে—

রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল, তুই থাম্, এগিয়ে যাচ্ছিস তা-তাড়াহুড়ো ক'রে।

রাজেন এই রকম চারিদিকেই থাবা খাইয়া নেহাত অপ্রসন্নভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এমন জানিলে

কখনই আসিত না। গণশার ব্যবহারে তাহার দুঃখটা বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, গানটি তাহার স্বরচিত, যদিও গণশার সুর দেওয়া। রাজেন 'বাসর-তাণ্ডব' নাম দিয়া ঝালোয়ার প্রদেশের রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটা নাটক লিখিতেছে। ঝালোয়ার-সামন্ত সুব্বা সিং বাসরঘরে রাজপুত বীরাঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ মীরাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে তন্ময় হইয়া গানটি গাহিতেছেন, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, দুর্গপাদদেশে মুঘল সৈন্য।

এই সময় ত্রিলোচনের বিবাহের হাঙ্গামা আসিয়া পড়ায় নাটকটা আর অগ্রসর হয় নাই। রাজেন স্থির করিয়াছিল, রাজপুতদের জিতাইবে; কিন্তু গণশার দুর্ব্যবহারে মেজাজটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া যাওয়ায় মনে মনে ভাবিতেছে, গণেশশঙ্কর নাম দিয়া একটা তোতলা দাগাবাজ ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া রাজপুত-বাহিনীকে মুঘলের হস্তে বিধ্বস্ত করাইয়া দিবে।

গোরাচাঁদ কে. গুপ্তকে বলিতেছিল, লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রকম খাওয়াবে কে জানে!

এমন সময় ত্রিলোচনের পিতা ডাক দিলেন, বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা।

গোরাচাঁদ কাছে গিয়া বসিল। ত্রিলোচনের পিতার চোখ দুইটি একটু রক্তাভ, বেশ অনায়াসেই যে চাহিয়া আছেন এমন বোধ হয় না। গোরাচাঁদের কাঁধের উপর কোমলভাবে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা?

গোরাচাঁদ এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু প্রশ্নকর্তার অবস্থা দেখিয়া সহজে অব্যাহতি পাইবার আশায় উত্তর করিল, আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন, কিছু তফাত নেই তো। তিলুকে নিজের ভাই জেনেই তো এসেছি বাবা।

তা হ'লে একটি কথা,—কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ ক'রো না আজ।

গোরাচাঁদ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ! একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর তাহার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হইল; বলিল, আজ্ঞে, আমরাও যা, ত্রিলোচনও তাই; কিন্তু ওর আজকে বিয়ে ব'লে কিছু খেতে নেই, আর আমরা তো শুধু বরযাত্রী হয়ে এসেছি কিনা—

সেজন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবছি, আমাদের কি অপমানটা করলে, দেখলে না? আমি যৎপরোনাস্তি রেগেছি গোরাচাঁদ; এই আমি আর তোমাদের মেসো ব'সে আছি, বর তুলে নিয়ে যাক তো আমাদের সামনে থেকে!

গোরাচাঁদ ভীত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হবে? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যে রকম অবুঝ আর বেয়াক্কেল লোক দেখছি, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—

ওরে, এই দিক পানে, অন্দরে নিয়ে যা, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা।

কয়েকটা ভারী দই-ক্ষীরের তিজেল বাঁকে লইয়া, একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। গোরাচাঁদ সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া লইয়া বলিল, কি যে বলছিলাম? হ্যাঁ, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—এমন কি, না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গাম করতে পারে। তাই বলছিলাম—

ত্রিলোচনের পিতা গণশাকে ডাক দিতে যাইতেছিলেন। গোরাচাঁদ ত্রস্তভাবে বলিল, আমি দিচ্ছি ডেকে, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন? হ্যাঁ, ও বরং চালাক আছে, যা বলে—

গিয়া গণশাকে বলিল, ত্রিলুর বাবা ডাকছেন রে। একটু চাপা গলায় তাড়াতাড়ি টিপিয়া দিল, দেখিস, যেন মেলা আত্মীয়তা করতে

যাস নি ; তা হ'লে আমার মতন বেকায়দায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে, ভয়ানক খাপ্পা হয়েছে এদের ওপর।

এই সময় কন্যাকর্তা গলায় গামছা দিয়া করজোড়ে বরের আসরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণভাবে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এইবার বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেয়াই-মশাই কোথায়? এই যে—

কাছে গিয়া বলিলেন, তা হ'লে দাদা, অনুমতি দিন এইবার।

গোরাচাঁদ, গণশা, ত্রিলোচন সকলেই রুদ্ধশ্বাসে একটা বিষম দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিতা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-সুস্থে উঠিয়া কন্যাকর্তাকে বুকে জড়াইয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি—ওফ! গলাটা অশ্রুবদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।

যাইবার সময় ত্রিলোচন বন্ধুদের দিকে একটা বিপন্ন অসহায় ভাবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। কে. গুপ্ত একটু কাছে ছিল, সাহস দিয়া বলিল, যান, ভগবান আছেন।

বর চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ত্রিলোচনের পিতার নিকট গেল; ডাকিল, জ্যাঠামশাই!

ত্রিলোচনের পিতা শোকাচ্ছন্নভাবে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরিয়া বসিয়া ছিলেন, মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, কে, গোরাচাঁদ? গোরা রে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত—ওফ!

গোরাচাঁদ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম, আর তবে না-খাওয়া হাঙ্গামাটাও ক'রে কাজ নেই, কি বলেন? যখন মিটেই গেল—

বর চলিয়া গেলে কন্যাপক্ষের একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বরষাত্রীদের মধ্যে কাঁরা এই গাড়িতে ফিরে যাবেন যেন ?

ঘোঁৎনা বলিল, হ্যাঁ, সহায়রামবাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ওই ঘরে রয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা বলিল, দুজন তা হ'লে? বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা ক'রে দিই। কজন আছেন সব মিলিয়ে ?

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আছি, আমি এক, ঘোঁৎনা দুই—

গণশা নীচু গলায় ধমক দিয়া বলিল, খা-খ্‌খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখবি নি? রাজুকে খোঁ-খ্‌খোঁজ নিতে পাঠালাম কি করতে? আজ্ঞে না, আমরা একটু ফুর্তিটুর্তি করি, খাওয়া তো রোজই—

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা করুন। কই হে, এঁদের ডেকে নাও না তোমরা। শিবপুর থেকে এসেছেন, গান-বাজনার দেশ ; বলে, গাইয়ে বাজিয়ে সুর, তিনে শিবপুর।

সভার এক দিকে গান-বাজনা হইতেছিল। এক চুড়িদার-পাঞ্জাবি-পরা ছোকরা শীর্ণ কাঁধের উপর কেশভারাক্রান্ত মাথাটা প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া নাড়িয়া গান গাহিতেছে, সাত-আটটি সমবয়সী মন্দিরা বাজাইয়া, শিস দিয়া, হাততালি দিয়া, তুড়ি বাজাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আশপাশের আর সকলে সমস্ত দলটির মৃত্যুকামনা করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথায় একজন বলিল, আমরা তো তাই চাই। আপনারা দয়া ক'রে—

গণশা সবার মুখপাত্র হইয়া বলিল, মা-ম্মাপ করবেন ; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গ্‌গাইতে বাজাতে জানে না।

ওদিককার একজন বলিল, সে কথা শুনব কেন মশাই? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলে—

অপর এক ছোকরা জুড়িয়া দিল, গিটকিরি ছাড়া তো কিছু বেরুবেই না।

গণশা একটা রাগারাগি গণ্ডগোল করিতে যাইতেছিল, রাজেন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত দিয়া চাপা গলায় বলিল, হাড় কখানির মায়া রাখ?

গণশা ফিরিয়া বলিল, কেন, কি হয়েছে?

তা হ'লে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম ক'রো না। যা ক'রে বেঁচে এসেছি, আমিই জানি। বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না-যাব ভাবছি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে, ভেতরে চলুন না, বাইরে কষ্ট করছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধের ওপর হাত দিয়ে—কে মশাই আপনি? ফিরে দেখি, ইয়া লাস, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পরে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, কনের কাকা, নাম জগুদা। থতমত খেয়ে বললাম, বরযাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখছি।

শুনে সুখী হলাম। একলা যে?

বললাম, তারা আসব আসব করছে।

শুনে সুখী হলাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না। কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে? মাতলামির আর জায়গা পাও নি?

আমি তো ভয়ে কেঁচোটি হয়ে সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে এলাম। দেখি, সেই সে কোণে হারামজাদা ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে, যদি কখনও শিবপুরে পাই ব্যাটাকে—

গান-বাজনার কথা লইয়া গণশার রাগটা চড়িয়াই ছিল, আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, ইডিয়ট! ভী-ভ্‌ভীরু কোথাকার! বি-ব্বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো—। চল্‌ সবাই, দে-দ্দেখি কে কি করে! গণশা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগু পিছু হইয়া চলিল। রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গণশার পাশে রহিল। সদর ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা সোয়েটার মাত্র, সবল পেশীগুলা জাগিয়া আছে। একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া এদিকেই আসিতেছিলেন, রাজেন দূর হইতে চিনাইয়া দিল; অবশ্য চিনাইয়া না দিলেও কোন ভুল হইত না।

কাছে আসিয়া রাজেনকে লক্ষ্য করিয়া একটা খসখসে গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, এই যে, সবাইকে ডেকে এনেছেন!

রাজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, আজ্ঞে না, মানে হচ্ছে, এরাই সব বললে—

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, গোরাচাঁদ বললে, বরং খেয়ে নিলে হ'ত; আমি বললাম, তা হ'লে কনের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনিই সব করছেন কম্মাচ্ছেন—

রাজেন বলিল, আমি বললাম, আর জগুদা লোকও বড় ভাল।

গণশা বলিল, লো-ল্লোক ভাল শুনে আমি বললাম, চ-চ্চল্‌ তা হ'লে আম্মো যাই, জগুদাদার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয়ও হবে। সে-স্সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কিনা।

ভদ্রলোক বলিলেন, বেশ বেশ; কিন্তু দু-একটা জিনিস এখনও বাকি আছে। যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদবাবু না হয়—

ঘোঁৎনা বলিল, সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ, তুই তা হ'লে—। কোথায় গেল গোরাচাঁদ?

শুরুতেই যেই ঘোঁৎনা 'গোরাচাঁদ বললে' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, গোরাচাঁদ বহির্মুখী একটি ছোট্ট দলে ভিড়িয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কেহ আর কোন কথা কহিল না। শুধু কে. গুপ্ত একটু ছাপরেয়ে ইডিয়ম মিশ্রিত করিয়া বলিল, খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, গ্র্যাণ্ড ফুল ব্যাক হয়, গোষ্ঠ পালের জোড়া।

আরও ঘণ্টা দুয়েক কাটিল। দলটা খানিকক্ষণ স্রোতের কুটাকাঠির মত এদিক সেদিক করিয়া কাটাইল। দুই-একজন সহায়রামবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেও চাহিল; বাকি সবাই তাহাদের আটকাইয়া রাখিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই আবার আসরে আসিয়া জুটিল। ভাঙা আসর, এখানে সেখানে এক-আধজন শুইয়া গড়াইয়া আছে। আশে-পাশেও লোক বিরল, আলোও বেশির ভাগ নির্বাপিত। গোরাচাঁদ একটা বালিশের উপর কাত হইয়া বলিল, খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরেয় প'ড়ে গিয়েছিলাম, এই যা।

খানিকক্ষণ খাওয়ার আলোচনাই চলিল।

গোরাচাঁদ আবার বলিল, রাজু, তোর পদ্যটা পড় তো একটু, শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস—

'আজকে সখা দিল-পেয়ালায় ফুর্তি-সরাব উছলে ওঠে।'

ঘোঁৎনা বিরক্তভাবে বলিল, আরে দূৎ, উছলে ওঠে! ত্রিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না, পদে পদে বাধা; এ যেন—। গণশা কোথায়? দেখছি না যে?

রাজেন বলিল, তাই তো!

শুইয়া বসিয়াই সকলে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

কে. গুপ্ত হঠাৎ ঘোঁৎনার কাঁধটা নিজের কাছে টানিয়া বলিল, দেখুন তো, গণেশবাবুর মতই না?

ঘোৎনা বলিল, তাই তো বোধ হচ্ছে ; অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া ?

সদর-বাড়ির বাঁ দিক দিয়া একটা রাস্তা স্টেশনের দিকে গিয়াছে এবং তাহারই একটা সরু ফেঁকড়া ঘন বনজঙ্গল রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অন্দর-বাড়ির পিছন দিকে হারাইয়া গিয়াছে। সেই রাস্তাতেই একটা বিচালির গাদার আড়ালে গণশাকে দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছে। বিচালিটা পার হইয়া বেশ সহজ ভাব ধারণ করিল। দলের মধ্যে আসিয়া সকলের উৎসুক প্রশ্ন নিবারণ করিয়া চাপা গলায় বলিল, চুপ।

বলিয়া নিজেও একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘোৎনা তাহার কাপড় হইতে একটা চোরকাঁটা ছাড়াইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলি রে গণশা ?

গণশা মুখটা একটু নীচু করিল, সবাই ঘেঁষিয়া আসিলে বলিল, তি-ত্তিলুর বাসরঘর দেখে এলাম।

'সে কি !' 'দূৎ, মিছে কথা।' 'মাইরি ?'—বলিতে বলিতে সবাই আরও ঘেঁষিয়া আসিল। কে. গুপ্ত বলিল, ত্রিলোচনবাবু আছেন তো ? —কানটান—জামায় রক্তটক্ত—

আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্রলোচন ইন্দ্র হয়ে ব'সে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি—

রাজেন কল্পনায় চিত্রটা আঁকিয়া লইয়া বলিল, উঃ, যেতে হবে মাইরি।

গণশা জানাইয়া দিল, অভিযানটা বেজায় শক্ত। সরু রাস্তাটা একটু গিয়া আর নাই। তাহার পর দূরের গান-বাজনা আর মাঝে মাঝে হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া, ঘন আগাছার মধ্য দিয়া ছাই, গোবর, ভাঙা ইট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়া বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছিতে

হইবে। সে আরও মারাত্মক জায়গা, চাপ জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি-দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা, শীতের জন্য বন্ধ। একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নীচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি উড়িয়া গিয়াছে। ভ-ভগবানের দয়া—। বলিয়া গণশা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল, বো-ব্বোঝ ; চাও যেতে কেউ?

ঘোঁৎনা বলিল, আলবৎ যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে?

কে. গুপ্ত বলিল, সাপখোপ—

ঘোঁৎনা ধমক দিয়া বলিল, রাত্তিরে ওই নাম করছেন? আচ্ছা কাঠগোঁয়ার তো!

কে. গুপ্ত ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

গণশা বলিল, তবে হ্যাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা-ম্মাঠ আছে ; যদি তাড়া করে তো—

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, কি দেখলি জানলার ফাঁক দিয়ে গণশা? এক ঘর বুঝি খুব সুন্—

রাজেন বাধা দিল, থাক্, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে।

সে করাও যায় না।—বলিয়া গণশা সকলের উৎসুক কল্পনাকে একেবারে চরমে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল।

৪

দুইটা জানালার মধ্যে হাত চারেকের জায়গা। একটা রাজেন আর গণশা, অপরটা ঘোঁৎনা আর কে. গুপ্ত দখল করিল।

পথে গোরাচাঁদের পা দুইটা হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবর-গাদায়

ডুবিয়া গিয়াছিল। গণশার কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলিল, ওরে গণশা, বড্ড কুটকুট করছে ; উঃ, কি করি বল্ তো ?

গণশার মন তখন অন্য রাজ্যে। একটি ষোড়শী আসিয়া কনের মুখের ঘোমটা তুলিয়া ত্রিলোচনকে বলিতেছে, এই দেখ ভাই। আহা বেচারী এইজন্যে মনমরা হয়ে ছিল গো! দেখ দিকিন কেমন!

গোরাচাঁদ গণশার কাঁধটা একটু টিপিয়া বলিল, শুনছিস ? গেলাম, গেলাম মাইরি, গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল।

গণশা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিল, কি ক'রে জানলি ?

গোরাচাঁদ খিঁচাইয়া বলিল, কি ক'রে জানলি! ভয়ানক কুটকুট করছে যে পা দুটো।

গণশা চোখ দুইটা ছিদ্রপথে আরও ভাল করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল, ঘোঁৎনার জামার খুঁটে একটা টান দিয়া বলিল, ঘোঁতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—

না, হয় না ; ফেলে দে।—বলিয়া ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষবদ্ধ করিল।

ষোড়শী ঢলঢলে চোখ দুইটি তখন বরের মুখের উপর রাখিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, হ্যাঁ ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখ একখানা দেখিয়ে দিলাম, মজুরি হিসেবেও একখানা গান—

একটি কিশোরী বলিল, হ্যাঁলা সরোদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয় ? কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয় ?

ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে টিপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, দেখলেন, ওইটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যাসুন্দর আউড়ে দিলে!

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, সে আবার কি ?

ঘোঁৎনা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিল, তোমার মুণ্ডু, ছাতুখোর !

ওদিকে রাজেন গণশাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিতেছিল, পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গণশা ? ধর্, যদি তেমন তেমন জরুরি হয় ? আচ্ছা, মাঘ মাসে ? মাঘ মাসের গোড়ায় দিন-টিন আছে কি না খোঁজ রাখিস ?

ঘরের ভিতর কানমলার অনেকগুলি সমর্থনকারিণী জুটিয়া গেল। ত্রিলোচন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া বলিল, থামুন ; আমি গাইব, তবে কথা হচ্ছে, গানের অন্তরাটা হারিয়ে যাচ্ছে, বাংলা নয় কিনা। যদি একবার ভেতরের বারান্দায় গণশাকে ডাকিয়ে পাঠান তো—

গণশা তাড়াতাড়ি মুখটা সরাইয়া লইয়া অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফিসফিস করিয়া বলিল, কি সর্ব্বনাশ বল দিকিন ! ইডিয়ট ! এক্ষুনি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা—

রাজেন দেখিতেই ছিল ; হাতটা একবার 'না'র ভঙ্গীতে নাড়িয়া গণশাকে টানিয়া লইল। গণশা শেষের দিকটা শুনিতে পাইল, আমরা গণশা কি ঢ্যাপসা এদের ডাকতে যাই আর কি—

গোরাচাঁদ গণশা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের চিড়বিড়ানিটা বাড়িয়া যাওয়ায় এক রকম নাচিতে নাচিতেই সরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গণশাকে টানিয়া লইয়া চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আবার চাগিয়েছে রে, গেলাম মাইরি।

তুই সব মাটি করলি ; আয় তো এদিকটায় ফাঁকায় একটু স'রে। সেই মেয়েটা এতক্ষণ বোধ হয়—

পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে

সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই, 'ওগো বাবা গো, ডাকাত'—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন এক মুহূর্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্মের প্রেরণায় কাজ। কোন রকমে বাঁচিতে হইবে, যেমন করিয়াই হোক না কেন।

কে. গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সোজা সেই দিকে ঘুরিয়া ছুট দিল; সদরের দিকে নয়, একেবারে সোজা।

ওই পালায়, পেছু নাও।

উত্তর দিকে ছুটেছে।

ঘোঁৎনা পলাইবার উপক্রম করিয়া ঘুরিতেই একটা গাছে ধাক্কা লাগিল। বোধ হয় পেঁপেগাছ, খুব মোটা।

ওদিকে কে হাঁকিল, না, বন্দুক না নিয়ে বেরিও না; খবরদার। টোটা ভ'রে বেরুবে।

ঘোঁৎনা তরতর করিয়া পেঁপেগাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু উপরে উঠিয়াই টের পাইল, কতকগুলা ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ; আপাতত সেখানটায় একটু থামিল।

গণশা গোরাচাঁদের কোমরের র‍্যাপারটা টানিয়া বলিল, সা-স্‌সামনেই ফাঁকা মাঠটা, শিগগির নেমে পড়্।

রাজেন বলিল, তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল্, আমরা বরযাত্রী।

তুই আলাপ ক-কর্‌গে মুখ্যু।—বলিয়া গণশা গোরাচাঁদকে এক রকম টানিতে টানিতেই পা বাড়াইল।

পাশেই বাসরঘরে একটু যেন ধস্তাধস্তি হইতেছে। একজন বয়স্থার গলার আওয়াজ, ওরে, না না, জানলা খুলিস নি, ওদের হাতে বন্দুক থাকে, ওরে অ নীহার! কি নির্ভয় মেয়ে সব বাবা আজকালকার!

জানালাটা টানা-হিঁচড়ানির মধ্যে খুলিয়া গেল। রাজেন এক রকম লাফ দিয়াই গণশা-গোরাচাঁদকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পরেই পাতলা আগাছার মধ্য দিয়া ছুট। হাত-কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালুটুকু এক রকম লাফ দিয়াই কাটাইল; পরক্ষণেই ঝপাং ঝপাং ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ।

ওরে, পুকুরে পড়েছে—খিড়কির পুকুরে, তিনটে।

খিড়কির দরজা খুলিয়া গেল।

লালঠেনে হবে না, গ্যাস-লাইটটা নিয়ে আয়।

একটা টর্চ হ'লে হ'ত—বরযাত্রীদের কাছে একটা আছে, নিয়ে আয়; তারা ঘুমোচ্ছে বোধ হয়, জাগিয়ে দে।

তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রাজেন চাপাস্বরে বলিল, এই তোর মাঠ? কি ভীষণ পানা রে বাবা! উফ!

গণশা বলিল, ঘা-ঘ্‌ঘাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট্‌।

সমস্ত পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বেটাছেলের গলার আওয়াজ ক্রমেই বেশি শোনা যাইতেছে। নানা রকম প্রশ্ন, উত্তর, হুকুম।

এই পুকুরে?

হ্যাঁ, ঘিরে ফেল। লাঠি শড়কি যাই হোক, সবাই এক-একটা হাতে রেখো, ভয়ঙ্কর লাস এক-একটা।

রঘো বাগদীকে খবর দেওয়া হয়েছে?—এটা যেন জগুদার স্বর।

এক কোণ হইতে গগনবিদারক আওয়াজ আসিল, এজ্ঞে, এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েছি। নেমে পড়ব?

এপার হইতে উত্তর হইল, না, ঘিরে ফেল্ চারিদিক থেকে। ওরে, কুকুর দুটোকে খুলে দে।

দেখতে পাচ্ছ কেউ ?

রঘো বলিল, যেন তিনটে মাথা ওদিকপানে।

গণশা ডুব দিল।

দুটো।

রাজেন ও গোরাচাঁদ ডুব দিল।

গোঁত্তা দিয়েছে সব।

নজর রাখিস।

রাজেন মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কতক্ষণ ডুবে থাকা যায় ?

গোরাচাঁদ প্রতিপ্রশ্ন করিল, কতক্ষণ ভেসে থাকা যায় ? আমার পেটে জায়গাই ছিল না, তার ওপর জল—

রাজেন বলিল, পানার জল। উঃ, কি কামড়ায় র্যা ?

গণশা বলিল, মা-ম্মাছ—বোধ হয় পো-প্পোষা মাছ।

রাজেন বলিল, উঃ, পোষাই বটে ওদের, ছিঁড়ে ফেললে।

গোরাচাঁদ বলিল, আবার পচা গোবরের চার পেয়েছে কিনা।

যে টর্চ আনিতে গিয়াছিল, খিড়কির নিকট হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দুজন খালি মদ খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, প'ড়ে থাক্, উঠিও না।

পুকুরের এক দিক হইতে জগুদার কর্কশ আওয়াজ হইল, আপনারা তা হ'লে কোন্ দিকে আছেন মশাই ? একবার টর্চটা বের করুন না।

অপর একজন বলিল, তারা আবার এই সময় কোথায় গেল ? পরের ছেলে—ভাবনার কথা তো !

গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, এই গণশা, এই তালে জানিয়ে দে, আমরা এখানে, কোন ভাবনা নেই।

রাজেন বলিল, আর টর্চটা ভিজে গেছে।

গণশা বোধ হয় জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় পাশে একটা ঢিল আসিয়া পড়ায়, সে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল।

ওই যে, ওইখানটায় একটা ঘায়েল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট বড় ঢিল আসিয়া আশেপাশে পড়িল। একটা বন্দুকের আওয়াজও হইল।

আর দেরি করা চলে না। গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল, ঢিল ছুঁড়বেন না আপনারা।

রাজেন বলিল, বন্দুকও ছুঁড়বেন না।

একজন কথাগুলা বাঁকাইয়া বলিল, বটে বটে, কি ছুঁড়তে তা হ'লে হুকুম হয় ?

একজন ইয়ারগোছের ছোকরা ও-কিনারা হইতে বলিল, ফুল ছুঁড়ুন চন্দনে ডুবিয়ে।

গোরাচাঁদ দম লইয়া বলিল, আমরা বরযাত্রীর দল।

চারিদিক একটু নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আধ মিনিটটাক মাত্র। তাহার পর সকলের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ওপারে কে একজন বলিল, রসিক আছে তো !

পেঁপেগাছ হইতে ঘোঁৎনা এই তালে বলিতে যাইতেছিল, আমিও একজন আছি এখানে; কিন্তু অবিশ্বাসের বহর দেখিয়া আর বলা হইল না।

পাশের কিনারা হইতে উত্তর আসিল, ওই যে শুনেছে বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না— ওরে আমার চালাক রে !

তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল ; পায়ে মাটি ঠেকিল।

রাজেন বলিল, না, দিব্যি ক'রে বলছি, আমরা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন। থু থু, কি পানা রে বাবা!

গণশা লম্বা ডুব দেওয়াতে অতিরিক্ত হাঁপাইতেছিল। রাজেন বলিল, রঘু বাগদী এদিকে নেই তো?

আবার সেই উৎকট বক্রোক্তি, বটে বটে, ওরে, রঘুকে ডাক্।

তিনজন আবার ঝপাঝপ করিয়া জলে পড়িল তখন জগুদার কণ্ঠের আওয়াজ হইল, আচ্ছা, উঠে আয়, কিন্তু এক এক ক'রে। রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক্, তোয়ের থাকবি কিন্তু।

রাজেন প্রথমে উঠিল। হাত-পা এক রকম অবশ হইয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে পাঁক, পানা, কুটাকাঠি। ঠকঠক করিয়া কাঁপুনি। কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের পরতে একটা বড় চাঁদামাছ লণ্ঠনের আলোয় চকচক করিতেছে। বুকটা হাপরের মত উঠানামা করিতেছে; কোন রকমে দুইটা কথা ধাক্কা দিয়া বাহির করিল, এই দেখুন।

পূর্বপরিচিত সেই কালো লম্বা ছেলেটা বলিল, বাঃ, কি চমৎকার!

আর একজন বলিল, চোখ জুড়িয়ে গেল!

গোরাচাঁদ উঠিয়া আসিল। রাজেনেরই মত, অধিকন্তু কাপড়টা খুলিয়া গিয়াছে, নীচে আণ্ডারওয়্যার। রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, এ গোরা।

সেই ফাজিল ছেলেটা বস্ত্রের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, হাইল্যাণ্ডার গোরা বলুন।

গণশা ফিরিয়াই আবার ডুব দেওয়ায় পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল; অর্ধমৃত অবস্থায় উঠিয়া আসিল। গোরাচাঁদেরই অনুরূপ, বাড়তির মধ্যে মাথায় একটা ছোট্ট কচুরিপানার চূড়া।

সেই ছেলেটা পিছন হইতে সম্ভ্রমের স্বরে বলিল, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

উঠেছে, উঠেছে ওই দিকে।—শব্দ করিতে করিতে চারিদিকের লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, কি বলছে? এরাও বরযাত্রী? দড়ি নিয়ে এস।

অন্য একজন বলিল, বরযাত্রীরা নেই কিনা, ধরা প'ড়ে তাদের জায়গা দখল ক'রে নিচ্ছে।

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছোকরাটা সামনে আসিয়া বলিল, আরে, তাদের যে আমি ইষ্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের দেখলেই জগুদা তক্ষুনি চিনে ফেলত, না জগুদা?—বলিয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

দেখতেও হ'ত না, গলা শুনেই চিনতাম।—বলিয়া একবার তাহার দিকে কেমন একভাবে চাহিয়া, হঠাৎ নিজের গলাটা পরিষ্কার করিবার দরকার পড়ায় জগুদা সরিয়া গেল।

কন্যাকর্তা বৃদ্ধগোছের। ছেলেটার দিকে পিটপিট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, তুই যেতে দেখলি তাদের? তা হবে; কয়েকজন চ'লে যাবে ব'লে তখন গোঁও ধরেছিল; আর তারা ছিল ছ-সাতজন।

গোরাচাঁদ বলিল, পাঁচজন ছিলাম।

জগুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর তাদের মধ্যে একজন তোতলা ছিল, সবচেয়ে হারামজাদা।

গণশা তাড়াতাড়ি দম লইয়া বলিল, এই যে ম-ম্মশাই, আম্মো রয়েছি; বে-ব্বেজায়—

মা-ম্মাইরি! অমনই তো-ত্তোতলা সেজে গেলে!

কন্যাকর্তা বলিলেন, অত তোতলা তো ছিল না।

দুই-তিনজন ধূর্তামি করিয়া বলিয়া গেল, একজন বোবা ছিল।

একজন খোনা ছিল।

একটা খোঁড়া ছিল।

তা এখনও হতে পারে।

কন্যাকর্তা প্রশ্ন করিলেন, বরযাত্রী তো ওদিকে কি করছিলে সব?

তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। রাজেন গণশাকে একটু ঠেলিয়া বলিল, বল্ না রে।

গণশা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে কহিল, আরে ছুৎ, আমার কথা বে-ব্বেশি আটকে যাচ্ছে, বি-ব্বিশ্বাস করবে না।

গোরাচাঁদ কহিল, রাজেন বললে, দিব্যি খাওয়ালে ভদ্দরলোকেরা; চল্, তিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসরে গান ধরেছে, বাড়ির পেছনে দিব্যি নিরিবিলিতে—

রাজেন যোগাইয়া দিল, পুকুরধারটিতে ব'সে—

দিব্যি নিরিবিলিতে পুকুরধারটিতে ব'সে একটু—

গণশা থাকিতে পারিল না, বলিল, আমি ব-ব্বললাম, থাক্, দ-দ্দরকার কি? মে-ম্মেয়েছেলেরা রয়েছেন—

গোরাচাঁদ গণশার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হানিল; একটু উপস্থিতবুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, আমি বললাম, মেয়েছেলেরা গান ধরলেই উঠে পড়ব, তাঁরা তো আমাদেরই বোনের তুল্য।

রাজেন বলিল, মার পেটের বোনের—

কন্যাকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, সব ধাপ্পাবাজি! মার পেটের বোনের! কেউ গেল থানায়? রঘু!

রঘু বাগদী পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, এজ্ঞে, এই যে আছি মুই। আপনাদেরও যেমন হয়েছে কত্তা, ওইসব কথা পেত্তয় করেন! আয়েশ ক'রে গান শোনবার কি নন্দনকানন রে! সব একেলে শৌখিন ডাকাত, দেখছেন না?

রঘুর উপস্থিতিতে এবং কথাবার্তায় সবাই আরও ঘাবড়াইয়া গেল। রাজেন বলিল, আচ্ছা, পুলিস ডাকবার আগে আমাদের কর্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁরা তো ভুল করবেন না।

গোরাচাঁদ বলিল, না হয় বরের কাছে।

কর্তা শাসাইয়া উঠিলেন, খবরদার, বরের কাছে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়।

পিছন হইতে একজন বৃদ্ধগোছের লোক বলিলেন, আর দেখ, বর-কনে যেন ঘর থেকে না বেরোয়; কোথায় কে আছ, কত রকম বিপদ হতে পারে, দুর্গা দুর্গা!

জগুদা বলিল, আচ্ছা, বরকর্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে। রঘু, পাশে পাশে থাকিস।

তিনজনেই নিজের নিজের মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল, তা হ'লে একখানা ক'রে শুকনো কাপড় আর জামা—

সমস্ত দলটাতে একটা চেঁচামেচি-গোছের পড়িয়া গেল।

মাইরি?

ওঁদের জামাই সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

একটা চৌঘুড়ি নিয়ে এস।

যেমন ভাবে পুকুর থেকে উঠেছিলে সেই রকম ভাবেই যেতে হবে; তাতেও যদি চেনে, তবেই—

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটা বলিল, দময়ন্তী নলকে অমন অবস্থাতেও কি ক'রে চিনেছিলেন? বরং যে পানাগুলো খ'সে গেছে, আবার চাপিয়ে দাও।

অগত্যা সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে হইল। দলটা রঙ-বেরঙের মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আগে পিছে চলিল।

সদর-বাড়িতে মাঝখানের ঘরটিতে কর্তা ও বরের মেসো এক জায়গায় মড়ার মত পড়িয়া। এক কোণে পুরুতঠাকুর তাঁহার বধিরতার কল্যাণে গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। বাহিরের বারান্দায় দীনে নাপতে কাজকর্ম্ম সারিয়া কর্তাদের বোতল-ঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ষোল আনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

দলটা বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জগুদা 'বেয়াই-মশাই!' বলিয়া বরকর্তাকে জাগাইতে যাইতেছিল, সেই ছেলেটা হঠাৎ সামনে আসিয়া বলিল, দাঁড়ান, ওরাই আগে দেখাক, কে বরের বাবা, কে বরের মামা, কে বরের বোনাই, কে বরের—

তিনজনে কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, কেন, ওই তো বরের বাপ।

গণশা টীকা করিল, ভ-ভ্রবতারণবাবু।

ওই বরের মেসো অনন্তবাবু, ওই পুরুত-মশাই—কালা, রাতকানা; বাইরে দীনে নাপতে।

ছেলেটা দমিবার নয়, চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, সব খোঁজ নিয়েছে রে!

একজন বলিল, বোধ হয় শিবপুর থেকে ধাওয়া করেছে।

অনেক ডাকাডাকি এবং পরে ঠেলাঠেলির পর ভবতারণবাবু 'উঁ' করিয়া এক শব্দ করিলেন। দুই-তিনজন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, দেখুন তো, এই কি আপনাদের বরযাত্রী?

অনেকবার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্তা রক্তাভ চক্ষু দুইটি চাড়া দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করিলেন; আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার একটু মর্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, কে বাবা, নন্দি-ভিরঙ্গি, থিলোচনের বরযাত্র এশ্চো? এক শিল্‌ম চড়াও তো বাবা।

তিনজনেই এক রকম আর্তস্বরেই চীৎকার করিয়া বলিল, জ্যাঠা-মশাই, আমরা গোরাচাঁদ, রাজেন, গণেশ—

গজানন, শিঃ, তুই শেষ্কালে বাপের বিয়ে দেখতেলি ?—বলিয়া অবশ অঙ্গুলি দিয়া সবাইকে সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃথা পরিশ্রম ভাবিয়া তাঁহাকে আর কেহ জাগাইতে চাহিল না।

বরের মেসো অনন্তবাবুর একটুও সাড়া পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ নিরাশভাবে বলিল, হা ভগবান!

পুরোহিত মহাশয়কে তোলা হইল। কথাটা তাঁহাকে শুনাইতে এবং ভাল করিয়া বুঝাইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হইল। তিনি বলিলেন, ডাকাতরা বলছে, বরযাত্রী ? তা আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখ না হয়।

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল, ন্যায়রত্ন-মশাই, আমি গোরাচাঁদ।

গোরাচাঁদ, এস দাদা, আজকের দিনে আর কি আশীর্বাদ করব ? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক, কন্দর্পকান্তি হও—

সেই সর্বঘটের ছেলেটা একটু কাছে ঘেঁষিয়া চেঁচাইয়া বলিল, কন্দর্পকান্তি আশীর্বাদের আগেই হয়ে ব'সে আছে।

পাশ থেকে কে একজন বলিল, মানস-সরোবরে চান ক'রে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বইকি, তোমরা সুপুরুষ তো আছই ; তা গোরা রে, এঁরা কি বলছেন, ডাকাতরা নাকি বলছে, তারা বরযাত্রী ? কি অনাসৃষ্টি! চিনে দাও তো দাদা।

রাজেন বলিল, এরা বলছে—এঁরা বলছেন, বরযাত্ররা ডাকাত।

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত ?

দলের একজন ডান হাতটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল, সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা, এখন তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল? ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?

গণশা মরিয়া হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, ম-ম্মশাই, আমি পারলে সো-স্‌সোজা ক'রেই বলতাম, কি-ক্কিন্তু সত্যিই তোতলা; দয়া ক'রে একবার বর তি-ত্তিলুর কাছে নিয়ে চলুন, তারপর পু-প্পুলিসে দিয়ে দেবেন না হয়। উঃ, শী-শ্‌শীতে কালিয়ে গেলাম।

বলা বাহুল্য, কথাবার্তার ভঙ্গীতে অনেকের সন্দেহটা মিটিয়াই আসিতেছিল, বিশেষ করিয়া বয়স্থদের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, তাই নিয়ে চল না হয়, রঘুকে এগিয়ে দাও।

কর্তা বলিলেন, জগু, বাড়ির মেয়েদের তা হ'লে বলগে।

দলটি তিনজনকে ঘিরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি আর মেয়েরা বরের চারিদিকে বূ্যহ সৃষ্টি করিয়া বাহির-হইতে-পাওয়া খবরের টুকরাটাকরাগুলা লইয়া নিজের নিজের কল্পনাশক্তির পরিচর্চা করিতেছিল। কর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, একবার বরকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।

ওমা, কি অমঙ্গলে কথা, কি হবে! কোনমতেই না।—বলিয়া সবাই বূ্যহটা আরও সুদৃঢ় করিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। কন্যাকর্তাকে নিজেকেই ভিতরে যাইতে হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘোঁৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সন্তর্পণে পেঁপেগাছ হইতে নামিয়া চুপিসারে সদর-বাড়িতে দলটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেখানকার কথাবার্তায় আত্মপ্রকাশের উৎসাহ না পাইয়া খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া, কি হয়েছে

ব্যা গণশা? এত গোলমাল কিসের?—বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে—অ্যাঁ, তোদের এ কি দশা!—বলিয়া হাত-চোখ-কাঁধের ভঙ্গীসহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।

তিনজনেই বলিয়া উঠিল, ঘোঁৎনা যে! কোথায় ছিলি? দেখ্ না, এ ভদ্দরলোকেরা কোনমতেই—

ঘোঁৎনা গাছের উপর হইতে পুকুরপাড়ের সব কথাই শুনিয়াছিল, বলিল, তোরা যখন আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি—

মুরুব্বিয়ানায় গোরাচাঁদের গা জ্বলিয়া উঠিল, গণশা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে টিপিয়া থামাইল।

আমি ভাবলাম, দুত্তোর, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেছি, এদিকে একটা সোরগোল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একে অজানা জায়গা, তায় রাত্তির, খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক ক'রে শেষে পথ ভুলে—

একটা পেঁপেগাছে উঠে পড়লাম।

সবাই এই শেষের বক্তা সেই ফাজিল ছোকরাটির পানে চাহিল। তাহার ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার কেমন একটা গূঢ় শক্তি আছে, ইতিমধ্যে কখন ঘোঁৎনার পাশটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। সে নিজের টিপ্পনীর পর আর কিছু না বলিয়া ঘোঁৎনার চারিদিকের লোকদের সরাইয়া দিয়া ঘোঁৎনাকে একটু সামনে আগাইয়া দিল। সকলেই দেখিল, তাহার পিছনে, কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের সঙ্গে বাঁধা দুইটা ডাঁটাসুদ্ধ পেঁপের পাতা, একটা শুকনো, একটা পাকা—মাঝারি সাইজের। গাছে থাকিতে কখন আটকাইয়া কাপড়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, ঘোঁৎনার সাড় হয় নাই।

দোসরা ধাপ্পাবাজ। লাগাও চাঁটি।—একটা গোলমাল উঠিতেছিল, এমন সময় শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন আসিয়া রকে দাঁড়াইল।

সত্যিই যে তোরাই দেখছি! আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হ'ল কেন? আর কে. গুপ্ত কোথায়? গোরা, তোর দাড়িতে কি ঝুলছে, মুখ তোল্ তো!

দাড়িতে বোধ হয় একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছিল, কিন্তু মুখ তুলিবার তখন আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না—গোরাচাঁদেরও নয়, গণশারও নয়, রাজেনেরও নয়, ঘোঁৎনারও নয়।

সন্দেহ সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়ামাত্র একটা রব পড়িয়া গেল—

ওরে, শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।

কাপড়, জামা, র‍্যাপার—শিগগির।

চা করতে ব'লে দে, দেরি না হয়।

আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো—

সেই ছেলেটা বলিল, স্পষ্ট ক'রে বললেই হ'ত জগুদাকে।

ওরে, নিয়ে এলি কাপড়? দেরি কেন?

কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ। একটু মিষ্টি ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।

শিক্ষা-সঙ্কট

১

বড়বাজার হইতে ঠিক দুপুরে পিকেটিং সারিয়া আসিয়া ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী সুচারু শুনিল, তাহার বিবাহ। এই লইয়া একটা প্রোটেস্ট-মিটিঙের যোগাড়-যন্ত্র করিবার কিংবা তাড়াতাড়ি জেলে ঢুকিয়া পড়িবার পূর্বেই সে বধূবেশে বি-এন-ডব্লিউ-আর-এর একটি স্টেশনে, সুদূর বেহারে, তাহার স্বামীর ঘরে আসিয়া হাজির হইল। ব্যাপারটির আকস্মিকতা সম্বন্ধে বন্ধুকে লেখা তাহার নিজের একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—ভাই, চোখে দেখতে দিলে না, কানে শুনতে দিলে না, একেবারে ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল। যখন বুঝলাম, এ প্রভাতফেরিও নয়, বড়বাজারও নয়, পুলিসও নয়, তখন টূ লেট, সময় উতরে গেছে; দেখি, গাড়ি থেকে নেমে মূর্তিমতী সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের মত পিছনে পিছনে স্বামীর ঘরে ঢুকছি।

প্রথমবারে অতটা বোঝা যায় নাই। বিয়ের উপলক্ষ্যে আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়িটা গমগম করিতেছিল; তিন-চারিটা দিন গোলমালে এক রকম কাটিয়া গেল। অবস্থাটা টের পাওয়া গেল ঘর করিতে আসিয়া, প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।

জায়গাটি অজ পাড়াগাঁ। চারিদিকে টানা মাঠ, মাঝখানটিতে স্টেশন আর গোটাকতক কোয়ার্টার্স। তারের বেড়ার বাহিরে এখানে ওখানে ছড়ানো দুই-চারিটা দরিদ্র চালাঘর, থাকে দশাঁই, নবাবজান, বুধনী, তেতরী, দুখিয়ার মা। কেহ কুলীর কাজ করে, কেহ এঞ্জিনের ছাই বাছিয়া বাবুদের কয়লা যোগায়, কেহ মালগুদাম ঝাঁট দিয়া ধান গম বাছিয়া দিন গুজরান করে।

বাঙালীর মধ্যে বড়বাবু, মালবাবু আর পোস্ট-মাস্টারবাবু—এই তিন ঘর। আর এক ঘর আছে, তবে ঠিক প্রতিবেশী বলা চলে না, মাইল দুয়েক দূরে স্বরষপুরার করালীবাবু, তামাকের ব্যবসা করেন, আর কিছু জমিজমাও আছে। সংক্ষেপে 'তামাকবাবু' নামে পরিচিত। উৎসবে ব্যসনে সব কয়টি একত্র হয়।

বড়বাবু গান্ধীজীর উপরে মর্মান্তিক চটা। তাহার উপর আবার দৈব উপহাসের মত এক গান্ধী-শিষ্য এই রকম ঘাড়ে আসিয়া পড়ায় বিদ্বেষটা ইদানীং আরও বাড়িয়া গিয়াছে যেন। নিজের সহযোগীদের একত্র করিয়া বলেন, গবর্মেণ্ট তো ব্যতিব্যস্ত হবেই, তোমাদের নিজেদের কথা ভেবে দেখ না গো। জান, দিনে রেতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাতখানি গাড়ি আসবে, সাতখানি যাবে; বেশ নিশ্চিন্দি আছ; হঠাৎ খবর এল, স্পেশ্যাল গুড্স রান করছে, কেমন সামাল সামাল প'ড়ে যায়? মনে হয় না, এ আবার কোথা থেকে এক উপদ্রব এসে জুটল রে বাবা? লাটসাহেব থেকে গ্রামের চৌকিদারটি পর্যন্ত লাইন-বাঁধা, হাজার রকম কাজ, সেইগুলোকে গাড়ি ব'লে ধ'রে নাও, দিব্যি গতায়াত চলছে; মাঝখান থেকে তোমার গান্ধী ব'লে বসলেন, আমি এর মধ্যে আমার খদ্দরের মালগাড়ি এনে ফেলব।

সমস্ত আন্দোলনটি এক কথায় পরিষ্কার হইয়া যায়। নীরব প্রশংসায় কেহ ঘাড় নীচু করিয়া টেবিলে আঁচড় কাটিতে থাকে; কেহ কেহ বা পরস্পরের মুখের দিকে চায়; কেহ বলে, অথচ এই সহজ কথাটা কেউ বোঝে না, দেখুন তো!

কথাগুলা অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছায়।—বড়বাবু যখন বলতে আরম্ভ করেন, বুঝলে গা?

স্বচারুর কানেও উঠে। আগে চুপ করিয়া থাকিত; এখন বলে, আমার সামনে বলতেন, তবে তো—

স্বামী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, বলে, তুমি কি বড়বাবুর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে নাকি ?

বড়বাজারের ভূতপূর্ব ভলাণ্টিয়ার সোজা জবাব দেয়, কেন, বড়বাবু পীর নাকি ?

২

ঠিক কোমর বাঁধিয়া সামনা-সামনি ঝগড়া এখনও হয় নাই, তবে এক সময় যে না হইতে পারে, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ অন্তরীক্ষ হইতে যুযুধান দুই পক্ষই বাক্যবাণ মোচন করিতেছেন, এবং সেগুলি নিয়তই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিয়া প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করিতেছে।

স্বামী বলে, তুমি বুধনী আর দুখিয়ার মাকে চরকা দিয়েছ বুঝি ? কেন এসব বাই বল দিকিন ? বড়বাবু এই সব নিয়ে যখন বাক্যি ধরেন, আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বলছিলেন, আর কেন বৃথা খেটে মরি মালবাবু ? গিন্নীরা স্বরাজ উইন করলে অন্তত মোটা পেন্‌শন একটা তো পাবই। বলে, সতীর পুণ্যে পতির স্বর্গলাভ—

সুচারু হাসিয়া বলে, আমার নাম ক'রে ব'লো, বলছিল—পতিদের নিতান্ত সেই রকম অধঃপতন না হ'লে এ রকম ভরসার কথা মনে উদয় হয় না ; দ্রৌপদী সতীর যখন বিবস্ত্রা হবার উপক্রম, তাঁর পাঁচটি পতিদেবতা নিশ্চয় নিশ্চিন্ত মনে ব'সে এই রকম স্বর্গবাসের কোন মহৎ কল্পনায় বিভোর ছিলেন। ভাগ্যিস বেচারীর তাঁদের আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের ওপরই নির্ভর করবার সুবুদ্ধিটা যুগিয়ে গিয়েছিল ! কথাগুলো বলতে পারবে তো ?

স্বামীর এখানেও মাথা কাটা যায়। লজ্জিতভাবে বলে, হ্যাঃ, আমি তাঁকে বলতে গেলাম ! একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি লোক—

কিন্তু কথাগুলা পৌঁছায় অন্য সূত্র দিয়া, আরও সালঙ্কারে এবং টীকাটিপ্পনী-সমন্বিত হইয়া।

দুপুরবেলা যখন কর্তারা স্টেশনে, মালবাবুর বাড়িতে মেয়েদের জমাট মজলিস বসে। বড়বাবুর স্ত্রী, কন্যা, বিধবা ভগিনী কিরণলেখা, পোস্টমাস্টারের খুড়ী আর দুই পক্ষ, স্বয়ং গৃহকর্ত্রী, এঁরা নিয়মিত সভ্যা। ক্যাজুয়েল ভিজিটার বা আগন্তুকদের মধ্যে তেতরী, দুখিয়ার মা, সুনরী, বুধনী। কখনও কখনও তামাকবাবুর বলদে-টানা শাম্পেনি আসিয়া হাজির হয়; দুই কন্যা নামিয়া পিছনের পা-দানির দুই পাশে সতর্ক-ভাবে দাঁড়ায়, গাড়োয়ান গিয়া বলদের জোয়াল চাপিয়া ধরে, তারপর হুঁকা হাতে মাঝে মাঝে দুই-একটি টান দিতে দিতে আর অস্বাভাবিক-ভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামেন তামাক-গিন্নী। হিন্দুস্থানীরা বলে—তামাকু-মাইজী, বাবুরা আখ্যা দিয়াছেন—টোব্যাকো-কুইন। সুবিপুল শরীর, যেমন দীর্ঘ, তেমনই আড়ে; হিন্দুস্থানীদের বারো-হাতি শাড়ি না হইলে কুলায় না। নামিয়াই মালবাবুর স্ত্রীকে বলেন, কই গো মালিনীদিদি, আমার ছিলিমটা আগে ভরিয়ে দাও ভাই। এইটুকু আসতেই হাঁপিয়ে মলাম, বিপর্যয় মোটা হওয়া যে কি বিপত্তি!

তাহার পর কন্যার দিকে চাহিয়া রাগিয়া বলেন, তবুও তোর বাপ বলবে, আরও দুখানা লুচি বাড়াও, আধখানা হয়ে গেছ। মিথ্যেরও তো একটা সীমে আছে?

ভারমুক্ত স্প্রিঙের শাম্পেনি তখনও দুলিয়া দুলিয়া সায় দিতে থাকে।

মজলিসটা মুখ্যত তাসের; গৌণত নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হয়, হাতের কাছে যাহা কিছু পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, সে রকম মুখরোচক প্রসঙ্গ জুটিলে গৌণটাই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাসের মতই ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া ফাঁটিয়া ফাঁটিয়া সবার মধ্যে চারাইয়া দেওয়া হয়, তাহার

পর সবাই নিজের নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী গুছাইয়া-গাছাইয়া তাসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মন্তব্য দিতে থাকে মাথা দুলাইয়া, পানের রসের সঙ্গে, গুল দোক্তা জরদার ঝাঁজের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া।

কোনদিন প্রসঙ্গটা হয়তো ঠাট্টার সঙ্গে হাজির হইল। মালবাবুর স্ত্রী বলিলেন, কি গো বড়গিন্নী, কথায় কথায় এত ভুল আজ? গোলামকে আর দুটো ক্ষেপ হাতে রাখতে পারলে না?

বড়গিন্নী এক টিপ গুল ঠোঁটের নীচে টিপিয়া লইয়া বলিলেন, গোলামকে হাতে রাখতে হ'লে বিবির সেপাই হতে হয়, তাও আর বাপ-মায়ে করে নি দিদি।

শরটির লক্ষ্য কোথায় সবাই বুঝিল। কেহ মুখ টিপিয়া হাসিল, কেহ শুধু মাথা নাড়িল, কেহ চিন্তিতভাবে তাস দিয়া শুধু বলিল, তা বটে।

বড়গিন্নী বলিলেন, কালকে সেই কথাই ও বলছিল কিনা, তুই একটা সামান্য বুকিং-ক্লার্ক, তোর পাস-করা বউয়ের কি দরকার বাপু! আবার ভলেণ্টিয়ার! সামলা এখন!

কিরণ বলিল, মেয়েটি কিন্তু বড় ভাল বাপু, যাই বল; আমি দুদিন গিয়েছিলাম কিনা, সর্বদাই হাসি, খুব আমুদে; তার মাঝে স্বদেশীর কথাও হয়। তা এমন গুছিয়ে বলতে পারে যে, আমাদেরই মনে হয়—

ভাজ জুড়িয়া দিলেন, কাছা কোঁচা এঁটে বেরিয়ে পড়ি।

পোস্টমাস্টারের দ্বিতীয় পক্ষ হাসিয়া বলিল, দাদাকে বন্দুক তলোয়ার কিনে দিতে বলতে হবে, না, যা বাণ আছে তাইতেই চলবে?

কিরণ ফিরিয়া চাহিল, হাসিয়া বলিল, মরণ আর কি! তা না চলে, যাদের অস্ত্রে রোজ শান পড়ছে তাদের নিয়ে গেলেই হবে।

মালবাবুর স্ত্রী বলিলেন, তা তাকে নিয়ে আসিস না বাপু ডেকে। আহা, পাসের পড়া মেয়ে ব'লেই যে লোক মন্দ হবে তার কি মানে আছে, শহরে তো ও রোগ এখন ঘরে ঘরে।

কোনদিন তেতরীর মেয়ের নবীনতম দাম্পত্য-বন্ধনের কথা উঠে। শুনেছ গা তামাক-গিন্নী, লছমিনিয়ার এ বরের সঙ্গেও বনল না ?

তামাক-গিন্নী হুঁকা হইতে মুখ ছিনাইয়া লইয়া বলেন, ঝাঁটা মার দেশের মাথায়।

ছোটদের মধ্যে কেহ বলে, এ দেশ না হ'লে কিন্তু তোমার হুঁকো তামাক বন্ধ হয় ঠানদিদি।

ঠানদিদি হাসিয়া বলেন, তা মিছে নয় ভাই ; রেণুর বিয়েতে তিনটি দিন ঠিক ছিলাম মেমারিতে, ঠিক তিনটি দিন গোনাগুনতি ; পেট ফুলে যাই আর কি ! হুঁকো তামাক নেই, সে আবার দেশ, ম্যাগো ! নাঃ, সে বিষয়ে এ দেশের যশ গাইতে হয় বইকি।

হুঁকায় দরদভরা জোর টান পড়ে।

যেদিন অন্য বিষয় না থাকে, ঝোঁক পড়ে বাড়ির কর্তাদের উপর। এ প্রসঙ্গে সবাই এমন সহজ অথচ গভীর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, প্রসঙ্গটি বেশ অল্পের মধ্যেই পুষ্ট হইয়া শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া উঠে।

আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই কিরণলেখা সুচারুকে টানিয়া আনিয়া মজলিসে হাজির করিল, এবং অবিলম্বেই এই জমায়েতটুকুর মধ্যে তাহার একটি বিশিষ্ট জায়গা মিলিয়া গেল। আর ইহার মধ্যবর্তিতায় সাধারণভাবে পুরুষ-মহলের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে বড়বাবুর সঙ্গে দিনের পর দিন তাহার বোঝাপড়া চলিতে লাগিল।

কেহ শুধু বার্তাবাহিকারই কাজ করে, ওদিককার খবর এদিকে, আর এদিককার খবর ওদিকে হাজির করিয়াই খালাস। এ দলে আছেন বড়গিন্নী, মালবাবুর স্ত্রী, পোস্টমাস্টারের প্রথম পক্ষ। কতক, বিশেষ করিয়া নবীনাদের মধ্যে, সুচারুর দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং নূতন দীক্ষার উৎসাহে গুরুকেও টপকাইয়া গিয়াছে। এ দলে নবীনা

না হইলেও আছেন তামাক-গিন্নী। পরোক্ষ-আগত পুরুষদের কথায় সুচারু যখন জবাব দিতে থাকে, তখন ইহারা প্রচণ্ড বিক্রমে যোগান দেয়, মূল গায়েনের চেয়ে দোয়ারদের স্বর চড়া হইয়া উঠে। তামাক-গিন্নী হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে দিতে বলেন, তা হক কথা কইতে কখনও ডরাই না বাপু, কেন, পুরুষদের কি একটা ক'রে লেজ আছে যে, সবতাতে তাঁরাই সর্বেসর্বা হবেন?

পুরুষদের পক্ষও যে অবলম্বন করিবার লোক নাই এমন নয়, পোস্টমাস্টারের খুড়ী আছেন। মজলিস ত্যাগ করিয়া সুচারু উঠিয়া গেলে দুয়ারের দিকে লক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে মন্তব্য করেন, গলায় দড়ি।

গলায় দড়ি, কিন্তু কাহার? সুচারুর, না পুরুষমাত্রেরই? তাহাদের একমাত্র উকিল, পুরাতনের জীর্ণাবশেষ ভীমরতিগ্রস্ত এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধার অভিমতটা চব্বিশ ঘণ্টাও টিকে না। পরের দিন সুচারু মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতে দিতে যখন হাসিয়া প্রশ্ন করে, হ্যাঁ রাঙা-ঠাকুমা, আমার নাকি কাল গলায় দড়ির ব্যবস্থা হয়েছে? তিনি আকাশ থেকে পড়েন, বলেন, বালাই, ষাট, কে অমন কথা বলে র‍্যা, জিবের একটু আড় নেই? বালাই, ষাট, সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক্, নাতি-নাতকুড় নিয়ে ঘর—

হাসির হররায় আশীর্বাদের স্রোত চাপা পড়ে। কিরণলেখা বলে, আপাতত নাতি-নাতকুড়দের ঠাকুরদার সঙ্গেই ঘর করা মুশকিল হয়ে পড়েছে রাঙা-ঠাকুমা। এ বলে, চরকা কাট; ও বলে, টিকিট কাটবে কে?

ঠাকুরমা বলেন, তা তো ঠিকই বলে বাছা, টিকিট না কাটলে—

ঠিক তালের মাথায় সুচারু বাধা দেয়, মুখটা হঠাৎ ঠাকুরমার মুখের সামনে আনিয়া বলে, শরীর তো তোমাদেরই রাঙা-ঠাকুমা, এখনও এত

কাঁচা চুল মাথায়। হ্যাঁ রাঙা-ঠাকুমা, কে ঠিক বলে বল তো? না, আমি ব'লেই যে আমার মুখ চেয়ে বলবে, তা ব'লো না কিন্তু।

ওদিকে আঙুলগুলা আরও মোলায়েমভাবে চলিতে থাকে। ঠাকুরমা একটু ফাঁপরে পড়িয়া যান, খোশামোদ আর নগদ আরামের মোহ কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া বলেন, বলছিলাম, তা আর কি এমন অন্যায় কথা বলিস ভাই!

আবার হাসির লহর উঠে। কালা মানুষ আবার যাহাতে চটিয়া না যায়, তাহার জন্য তাড়াতাড়ি একটা মনগড়া কারণ খুঁজিয়া বলিতে হয়।

কথাগুলা রাত্রে বড়বাবুর কানে উঠে মন্তব্য সমেত। বড়গিন্নী হাসিয়া বলেন, খুব উকিল পেয়েছ যা হোক।

বড়বাবু ভারী হইয়া উঠেন। বলেন, একটা বুড়ো-হাবড়ার কাছে আর বাহাদুরি কি? পড়েন একদিন শর্মার মুখের সামনে, ভলেণ্টিয়ারি ঘুচিয়ে দিই—শুধু কথার তোড়ে, যত সব—

বড়গিন্নী প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলেন, সে পারবে না বাবু, কেন মিছে বড়াই কর?

বড়বাবু কপালে চোখ তুলিয়া বলেন, আমি বড়াই করছি? ওই একফোঁটা একটা কনে-বউ, ওর কাছে আমি মুখে হারব? তুমি যে অবাক করলে!

এই সময় বরাবর ওদিকেও প্রায় এই ধরনেরই আলাপ চলিতে থাকে। স্বামী হীরু স্টেশন-মজলিসের রিপোর্ট দাখিল করিয়া বলে, বড়বাবুর মুখের কাছে তো পারবার জো নেই, বললেন—

বধূ সুচারু বলে, একপাল মেনিমুখো পুরুষের সামনে ও রকম সবারই কথা ফোটে। পড়তেন আমার সামনে—

স্বামী বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকাইয়া বলে, বল কি তুমি?

স্ত্রী বলে, কেন, বড়বাবু কি পীর, না পয়গম্বর, শুনি ?

সাক্ষাৎকারের এ রকম প্রবল বাসনার জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক, রহস্যপ্রিয় বিধাতাপুরুষ একটু সুযোগ করিয়া দিলেন। ঠিক সুযোগ বলা যায় না, দুর্যোগ।

৩

গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন কিছুদিন মুলতুবি রহিল।

দেশের নারীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বরাজ-রণে নারীশক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, এই অবসরে জাতির মধ্যে তাঁহাদের স্থানটা কোথায়, সেই সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে চান। যেখানে তাঁহারা স্ত্রী, সেখানে আসলে তাঁহারা কি? চরণাশ্রিতা দাসী, না তুল্যপদস্থা, না অভিভাবিকা? যদি অভিভাবিকা নয়, তো কেন নয়? কোন্ স্বার্থান্বেষী ধূর্ত, কোন্ প্রবঞ্চক দায়ী তাহার জন্য?

স্বরাজ-সেনার অনেককে না পাইলেও এ বাহিনীর তেমন ক্ষতি হয় নাই ; কেন না, এই গৃহ-যুদ্ধে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিবার মত কর্মীর মোটেই অভাব হয় নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন, কেন, আর স্ত্রী হওয়াই বা কিসের জন্য? ঢের হইয়াছে ; একেবারে গোড়ায় কোপ দিয়া আলাদা হও। পুরুষের বুজরুকি এতদিনেও চিনিলে না?

যাঁহারা সাময়িক ইতিহাসের খবর রাখেন, তাঁহাদের 'উগ্রশক্তি' কাগজখানার অভিযানের কথা মনে থাকিতে পারে ; নেহাতই উগ্রশক্তি বলিয়া নিজের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া যায় নাই।

এই সবের প্রতিধ্বনি সুচারুর বন্ধুর চিঠিতে খানিকটা শঙ্কিত হইয়া

উঠিয়াছে। লেখা আছে, আমার তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ও জাতকে আজীবন এড়িয়ে চলব। তোমার জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই ; এখন যাতে মানুষটির মাথায় পুরুষের সেই চিরন্তন বর্বর ধারণাগুলি বাসা বেঁধে তাকে অত্যাচারী, অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, আত্মম্ভরী অবিনয়ী, কঠোর—অর্থাৎ পুরুষ বলতে পৃথিবী যা এতদিন বুঝে এসেছে, তাই না ক'রে তোলে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা চাই। ওদের কর্মজীবনের মধ্য থেকে, ওদের চিন্তার মধ্য থেকে, এক কথায় ওদের নিজেদের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে ওদের টেনে বার ক'রে আনতে হবে। পুরুষের জার-(CZAR)-যুগ নষ্ট হয়েছে, এ কথা ওদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়ার ভার আমাদের ওপর ; আমরা যদি এতে অপারক কি পশ্চাৎপদ হই তো আমাদের ধিক—শত ধিক—সহস্র ধিক।

পুরুষের সংসর্গই হানিকারক, অন্তত স্নচারুর যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সে, শত্রুপক্ষের প্রতিনিধি তাহার স্বামীকে, পত্রখানি দেখাইয়াছে ; এবং এইখানি উপলক্ষ্য করিয়া নিতান্ত লঘুভাবে তাহাদের যে একচোট রহস্যালাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে নিতান্ত সহিষ্ণু নবীনারও সোজা মাথা হেঁট হয়। তবুও শিক্ষার—বিশেষ করিয়া এখানের লোকগুলির শিক্ষার—প্রয়োজনটা সে অস্বীকার করে না। ইহারা যাহাতে নবযুগের নারীকে পুরুষের পাশে তাহার ন্যায্য আসনটি অধিকার করিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ বা বিস্মিত না হয়, সেই শিক্ষা-দানের চেষ্টা তাহার নিজের গৃহে তো চলিলই, তাহা ছাড়া মজলিসেও এমন প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করিয়া দিল যে, প্রায় সকল সভ্যাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং স্বামী-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। তবে সুখের বিষয়, গৃহে কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি হইল না। সুচারুর লেখা

একখানি চিঠি হইতে তুলিয়া বলিতে গেলে—এখানকার অধিকাংশ স্বামীই এমন সিভিল আর ওবিডিয়েন্ট যে অল্প চেষ্টাতেই কাজ হাসিল হয়েছে। দু-একজন তো চাওয়ার অধিকই দিয়ে ব'সে আছে। আহা, বেচারী সব! এরা যুদ্ধের উপযোগীই নয়।

তামাক-গিন্নীর তো এক রকম স্বরাজ ছিলই, এখন একেবারে পূর্ণ-কর্তৃত্ব। পোস্টমাস্টারবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের শেষ রিপোর্ট—কাল রাত্রে খোকা উঠলে ও-ই ঘাড়ে ক'রে বাইরে নিয়ে গেল, ধোয়ালে, মোছালে, ঘুম পাড়ালে; করবে নাই বা কেন, বল? এতদিন ভুল ক'রে একাই তো ক'রে এসেছি। এমন কি, বৃদ্ধ মালবাবুর পর্যন্ত সুমতি হইয়াছে। অজীর্ণরোগী বলিয়া তিনি বরাবরই সকালে বেড়াইতে যান; আজকাল দুই পকেটে আলু পটল লইয়া বাহির হন, একখানি ছুরির সাহায্যে কুটনা কুটিয়া নিজের অভিনব কর্তব্যরাশির প্রথম দফা সাঙ্গ করিয়া বাড়ি ফিরেন।

সুচারু হাসে। ভাবে, দলপতিকে ছাড়াইয়া দল অনেক সময় আগাইয়াই চলে, তাহারা নিজেরাই কি গান্ধীজীর নরম ভাব লইয়া সব সময় কাজ করিতে পারিত?

বাকি কেবল বড়বাবু। তা তিনি এখন কয়েক দিন যাবৎ উপস্থিত নাই। প্রতি বৎসর এই সময়টা সপ্তাহ কয়েকের ছুটি লইয়া দেশে যান ক্ষেতের ধানচালের বিলি করিয়া আসিতে। এবারেও গিয়াছেন। অন্য পুরুষগুলিকে যে রেটে তালিম দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তামাক-গিন্নী, পোস্টমাস্টারের দ্বিতীয়া প্রভৃতি মনে করিয়াছিল, বড়বাবুকে লইয়া বেশি বেগ পাইতে হইবে না। তাহার পর সব পুরুষগুলির মানসিক উৎকর্ষের জন্য একটা ক্লাব-গোছের প্রতিষ্ঠিত হইবে। শেষে তাহাদের সঙ্কীর্ণতা একেবারেই লোপ পাইলে স্ত্রীরাও গিয়া যোগদান করিবে, এই ছিল খসড়া।

বড় ভুল বুঝিয়াছিল। বড়বাবু আসিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার পর প্রথমেই একসেট নূতন নাম সৃষ্টি করিলেন। হীরু হইল হীরামন বিবি, পোস্টমাস্টারবাবু হইলেন মেজগিন্নী, বৃদ্ধ মালবাবু হইলেন আঁবুইমা। বাহিরে সমস্ত দিন ঠাট্টা-তামাসায় জর্জরিত হইয়া হীরু আসিয়া বলিল, না বাপু, ওসব স্বাধীনতা-ফাধীনতা আমার দ্বারা হবে না, দিব্যি তো ছিলাম!

অন্য স্বামীগুলিও উল্টা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের দ্বিতীয়া আসিয়া মুখ অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে, বিনা কারণেই বাপের ধাঁজ পাওয়ার অপরাধে শিশুটিকে পিটিয়া দেয় এবং সুবিধা পাইলেই বড়গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, বড়দির ঢিলেপনাতেই সব মাটি হ'ল।

তামাক-গিন্নী অন্তরীক্ষ হইতে একেবারে বড়বাবুকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন, ঠিক তো, তুমি মাতব্বর, পরিবারকে পায়ে থেঁতলাতে চাও থেঁতলাও, অপর সবাইকে উসকে দেওয়া কেন? খুনসুড়ি!

এর উপর তিন-চার দিনের মধ্যে আবার এও শোনা গেল যে, বড়বাবু পাশের জংশন স্টেশনের থিয়েটার-পার্টিকে দিয়া অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার' পালা করাইবার উদ্যোগ করাইতেছেন।

প্রমাণ পাওয়া গেল, এখানকার দুই-একজন পার্টও লইয়াছেন। দুপুরবেলা মাঝে মাঝে স্টেশন হইতে যে অট্টহাস্যের রোল শোনা যায়, সেটা রিহার্সালেরই।

বড়বাবুর পিঠ-চাপড়ানিতে স্পর্ধাটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। মালবাবু নাকি রাত্রে বাড়িতে আসিয়া পার্ট মুখস্থ করেন শোবার ঘরে। স্ত্রী সবার সামনে নাক সিটকাইয়া বলিল, কি গেরো বল দিকিন? রাত একটা পর্যন্ত কানের কাছে মেয়েলী টোনে ভেংচি কাটা!

সেদিন রাত আটটা পর্যন্ত মেয়েদের জমায়েত পুরাদমেই চলিয়াছে। সাতটার গাড়িতে পাশের স্টেশন হইতে বুকিং-ক্লার্কের বাড়ির মেয়েরা আসিয়াছেন অনেকগুলি। দুপুরবেলা তামাক-গিন্নী আসিয়াছিলেন, আটক পড়িয়া গেলেন।

আজ আবার বেটাছেলেরা সব সাতটার গাড়িতে জংশন স্টেশনে গেল, নিশ্চয়ই পূরা রিহার্সালের জন্য। এমন কিছু সুখের কথা নয়, কিন্তু আজ অন্তত মজলিসটা জমিবার পক্ষে খুব সুবিধা হইয়াছে।

সকলে প্রাণ খুলিয়া তাস-লুডো-হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। স্টেশনের চার্জে মার্কারবাবু, সে এই সময়টা সিদ্ধিতে বুঁদ হইয়া থাকে; আর তাহা ছাড়া খোট্টা বলিয়া বাঙালী মেয়েদের কাছে আমলই পায় না। বেটাছেলেরা সাড়ে নয়টার গাড়িতে ফিরিতেই পারে না। সব আহার সারিয়া গিয়াছে, ফিরিতে সেই বারোটা।

একচোট হাসি-হল্লার পর ঘরটা একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। বুকিং-ক্লার্কের শালী মাথার কাপড়টা নামাইয়া দিয়া চুলের গোড়াটা কষিয়া দিতে দিতে বলিল, যাই হোক বাপু, এ রকম থিয়েটার ক'রে মেয়েদের অপদস্থ করতে যাওয়া বড়বাবুর ঠিক হচ্ছে না। আমাদের বেনারস হ'লে কেউ সইত না।

কথাটা এমন কোমল স্থানে স্পর্শ করিল যে, মজলিসে অঙ্গসঞ্চালনের জন্য যে আওয়াজটুকু হইতেছিল, সেটুকু পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। শুধু পোস্টমাস্টারের প্রথম পক্ষ ভিতরে ভিতরে একটু খুশিই হইয়াছিলেন, প্রসঙ্গটিকে চালু করিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, 'তাজ্জব ব্যাপার'টা হচ্ছে কি?

তামাক-গিন্নীর বড়মেয়ে রেণুবালার নূতন বিবাহ হইয়াছে। বিহারের পাড়াগাঁ হইতে বাহির হইয়া সে আজকাল নভেল-নাটকের একেবারে সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করিতেছে, আর সেটা জানাইবার আগ্রহটাও খুব। বলিল, তুমি হাসালে দেখছি বড় বউদি, অমৃতলাল হলেন নটরাজ, 'তাজ্জব ব্যাপার' তাঁর একখানা নামজাদা বই, আর তুমি ব'লে বসলে কিনা—। কোন্ দিন হয়তো বলবে, প্রসূনকুমারের 'প্রাণের বেসাতি'ও পড় নি, মনুজবাবুর 'তরুণীর করুণা' নাটকখানার নামই—

বাধা দিয়া পোস্টমাস্টারের গৃহিণী বলিলেন, ক্ষ্যামা দে ভাই, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না। আসল কথাটা জানিস তো বল্।

বুকিং-ক্লার্কের শালী বলিল, তাতে পুরুষেরা কুটনো কুটবে, বাটনা বাটবে, সংসারের সব পাট করবে; আর মেয়েরা পাস দিচ্ছে, রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে—

তেতরীর মা কলিকা সাজিয়া হুঁকায় বসাইয়া দিল; দুইটা টান দিয়া তামাক-গিন্নী বলিলেন, অতটা আবার ঠিক নয়; ও যেন পুরুষকে ছাপিয়ে যাওয়া, কি বলিস নতুন বউ?

সুচারু ভারিক্কে হইয়া বলিল, তা বইকি; তার থেকে বরং মিলে মিশে একসঙ্গে ব'সে তামাক খাওয়া ভাল।

সকলে হাসিয়া উঠিল; তামাক-গিন্নীও হুঁকা মুখে করিয়া যোগ দিলেন, বলিলেন, তোরা কেউ ধরলিও না, স্বাদও বুঝলি না; খালি ঠাট্টা ক'রেই কাটালি।

একটু চুপচাপ গেল। পরে কিরণলেখা চিন্তিতভাবে বলিল, আচ্ছা, বেটাছেলে সাজলে দেখায় কেমন মেয়েদের? বোধ হয়—

তাহার ভাজ বলিলেন, একবার দেখই না সেজে। দোব এনে

ভাইয়ের জামা কাপড়, ভাইয়ের মত চেহারাও আছে, এমন কি গলার আওয়াজটাও।

পোস্টমাস্টারের প্রথমা বলিল, তা হ'লে দিদিরও মাঝখান থেকে অনেক দিন আগের তোমার যুবা ভাইটিকে একটু দেখা হয়ে যায়।

বড়গিন্নী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, পোড়া কপাল!

কিন্তু কয়েকটি তরুণ মুখে কৌতুক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কি যেন সব মনে মনে আঁচিতেছে, অথচ মুখ ফুটিয়া বলিতে রা সরে না।

তামাকু-গিন্নীর মেজমেয়ে বলিল, নতুন বউদি তো বেটাছেলে সেজেছিলেন তাঁদের স্কুলের থিয়েটারে, সেদিন বললেন আমায়—

সুচারু লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, তোমার কানে ধ'রে বলতে গিয়েছিলাম।

কয়েকজন ধরিয়া বসিল, তা হ'লে সাজতেই হবে, কি সেজেছিলে বল, ছাড়া হচ্ছে না।

প্রবীণারা বলিল, সাজ না বাপু, একটু রঙ্গ দেখি; আর কেউ তো বেটাছেলে নেই আজ যে—

সবচেয়ে মর্মে গিয়া পৌঁছিল পোস্টমাস্টারের দ্বিতীয়ার কথাটা। অন্ধকারপানা মুখটা আরও ভার করিয়া সে বলিল, উচিতই তো; ওরা যেমন তোমাদের নিয়ে নকল করছে, সারারাত কানের কাছে ভেংচি কাটছে, তোমরাও তার পাল্টা জবাব দাও; নাই জানুক, নাই দেখুক, নিজেদের মনে একটা তৃপ্তি হবে তো।

বক্তার মুখের গাঢ় অন্ধকার অন্য সকলের মুখেও একটু ছায়াপাত করিল। নবীনাদের জিদ আরও বাড়িয়া গেল; হ্যাঁ, পাল্টা জবাব দেওয়া চাইই। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে সুচারুর নিজের মধ্যেও স্কুলের কৌতুকময়ী ছাত্রীটি উঁকি মারিতেছে; সে বলিল, হ্যাঁ, রঙ্গ যে বলছ, রঙ্গ কি একা-একাই হয় নাকি?

আবার একচোট চুপচাপ ; সব পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তামাক-গিন্নী বুকিং-ক্লার্কের শালীকে বলিলেন, তা হ'লে আপনিও সাজুন ; বেনারসের মেয়ে, তায় স্কুলে পড়া ; না, আমরা কোনও ওজর শুনছি না।

সে নিমরাজি হওয়ার সঙ্কুচিত ভাব দেখাইয়া বলিল, আমি শুধু মেয়ে-থিয়েটার দেখেছি মাত্র।

সমস্বরে মত প্রকাশ হইল, তার মানেই—করেছেনও, কিছু শোনা হবে না, নিন।

তামাক-গিন্নী হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতেছিলেন, বলিলেন, হ্যাঁ, শিকারী বেরালের গোঁফ দেখেই চেনা গেছে।

আবার একটা হাসির তোড় উঠিল। থামিলে বুকিং-ক্লার্কের শালী বলিল, তা হ'লে আপনাকেও বাদ দিচ্ছি না।

তামাক-গিন্নী হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া সাশ্চর্যে বলিলেন, আমায় !

কিরণলেখা জোর দিল, হ্যাঁ ঠানদি, তুমি তো হুঁকো হাতে আদ্ধেক পথ এগিয়েই রয়েছ ; কোন পুরুষের বরং তামাকু-মাইজী সাজতে হ'লে ভাবনার কথা।

হাসি কলরব বাড়িয়া চলিল। সুচারুর মনে একটা প্লট জমিয়া উঠিতেছিল, বলিল, ঠানদি যদি নামেন তো একটা জিনিস সবাইকে দেখিয়ে দিই ; আমাদের কলেজে হয়েছিল। ঠানদি না হ'লে কিন্তু হবে না। মাড়োয়ারী সাজা আর কারও দ্বারা হবে না, নেকিরাম মাড়োয়ারী—ইয়া ভুঁড়ি, ব্যবসা করেন আর কঙ্কড় খান—সে এক রকম গাঁজার মতন জিনিস।

সকলে এমন তুমুল গোলযোগ করিয়া তামাক-গিন্নীকে ধরিয়া বসিল যে, তিনি কোন রকমে রাজি হইয়া পরিত্রাণ পাইবার মাত্র অবসর পাইলেন।

স্ফূর্তির ঘূর্ণি-হাওয়া একে একে সকলকেই নিজ-গহ্বরে টানিতে লাগিল।

সুচারু কিরণলেখার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, মেন পার্ট আর একটি মাত্র বাকি রইল।

কিরণলেখা সত্রাসে হাতমুখ নাড়িয়া বলিল, না, আমি পারব না, দোহাই। আমি আর সব পারি, শুধু বেটাছেলে সাজা আমার দ্বারা—

তামাক-গিন্নী কৃত্রিম রোষে ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, তবে রে! আর আমি বুঝি কিছুই পারি না, পারি এক বেটাছেলে সেজে নাচতে আর গাঁজা খেতে?

সুচারু বলিল, না, তোমায় সাজতেই হবে কিরণঠাকুরঝি; এইবার ঠিক হয়েছে, ওঁরা দুজনে সাজবেন পিকেটার, দুটো খদ্দরের টুপি হ'লে ভাল হয়; আমি হব দারো— ; না, সে আর এখন বলছি না; তুমি হবে স্টেশনমাস্টার কিরণঠাকুরঝি, দাদার পোশাকও রয়েছে; একজন পয়েন্টস্‌ম্যান চাই, তুমি হও মেজদি।

তামাক-গিন্নীর মেজমেয়ে উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল, উঃ, কি মজাই হবে! শিগগির সাজো নতুন বউদি। উঃ, যদি দাড়ি গোঁফ পরচুলো থাকত!

বড়গিন্নী বলিলেন, সে দুঃখই বা থাকে কেন? ও তো কলকাতা থেকে জংশন ইষ্টিশানের থিয়েটারের জন্যে দাঁড়িগোঁফ সাজগোজ মেলাই কি সব এনেছে, আর পয়েন্টস্‌ম্যান সাজার জন্যে পানিপাঁড়ে বুধনের জামা আর পাগড়িটা আনিয়ে নিচ্ছি, সে এতক্ষণ রহড়িয়ায় তাড়ি গিলতে গেছে।

বাকি কথাগুলা একচোট হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। থামিলে সুচারু হাসিয়া বলিল, তা হ'লে তো সোনায় সোহাগা।

আমরা তা হ'লে তোমার বাসা থেকেই সেজে আসছি। কিরণঠাকুরঝি, জান তো কোথায় সাজগুলো আছে? আমায় কিন্তু আলাদা ঘর দিতে হবে সাজতে বাপু, কারুর সামনে আমি সাজতে পারি না। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই, স্টেশনে নেকিরাম মাড়োয়ারীর বিলিতী কাপড়ের গাঁটরি এসেছে, পিকেটারদের কাছে খবরটা পৌঁছে গেছে, ঠিক দলবল নিয়ে হাজির; (কিরণলেখার দিকে চাহিয়া) এদিকে স্টেশনমাস্টার বক্কেশ্বরবাবু আঁকাবাঁকা চালে নধর বপুখানি দোলাতে দোলাতে—

কিরণলেখা হাসিয়া চোখ রাঙাইয়া বলিল, আচ্ছা থাম্, আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই।

৫

জংশন স্টেশনে এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট-ক্লার্ক রমণীবাবুর বাসায় রিহার্সাল খুব জমিয়া উঠিয়াছে। রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজে, ডাউন ট্রেন খুলিবার সময় হইয়াছে। আমাদের বড়বাবু পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিলেন, যাই, আমি একবার ফোন ক'রে দেখে আসি, সে ব্যাটা মার্কার ওদিকে ধাতস্থ আছে কি না, গাড়িটা যাচ্ছে—। একবার গার্ড বনোয়ারীলালকেও ব'লে আসি, আমরা এখানে, সেখানে সব ঠিকঠাক ক'রে রেখে এসেছি—

একটি যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি বসুন, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি, গার্ড সাহেবকেও ব'লে দোব।

বড়বাবু বলিলেন, না, মার্কার যদি বুঁদ হয়ে প'ড়ে থাকে তো এই ট্রেনে চ'লেই যাব, ট্রেনখানা যাচ্ছে, ওদিক থেকেও ফিফটি-নাইন আপ গুড্স আসার সময় হ'ল, শেষে একটা কাণ্ড—! আর আমি না থাকলে

তো ক্ষতি হবে না, যাদের পার্ট আছে তারা তো রইলই। মার্কারবাবু যদি থাকে ঠিক, চ'লে আসছি।

টেলিগ্রাফ অফিসে প্রবেশ করিতেই তারবাবু একটা কাগজ বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম, একটা প্রাইভেট মেসেজ এইমাত্র এল।

বড়বাবু ভয়ত্রস্তভাবে কাগজটা হাতে লইলেন; মার্কার যদুনন্দন লিখিতেছে—"Tell Bara Babu come sharp at once Daroga entered house"। উদ্দেশ্য—বড়বাবুকে অতি শীঘ্র আসিতে বল, বাড়িতে দারোগা প্রবেশ করিয়াছে।

এই সময় দ্বিতীয় ঘণ্টা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হুইস্‌ল দিল। বড়বাবু কাগজটা মুঠার মধ্যে মুড়িয়া ছুটিয়া গিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

পথের সময়টুকু দুশ্চিন্তার মধ্যে কখন কাটিয়া গেল, টেরও পাইলেন না। গাড়ি হইতে নামিয়া সটান স্টেশন-ঘরে গিয়া দেখেন, যদুনন্দন ভয়ে সিদ্ধির নেশায় একেবারে জবুথবু হইয়া বসিয়া আছে। যাইতেই হাত পা নাড়িয়া বলিল, হামারা জরু কহলা ভেজী হায়, বড়বাবু, আপকা ঘরমে এয়সা এক দারোগা·· হামকো নেই বোলানেসে হাম কেঁও যায়গা? হাম কেয়া কিয়া হায়?

যদুনন্দন যে বীর নয়, এ জ্ঞান যদিও বড়বাবুর তখনও ছিল, তথাপি অনেকক্ষণ পরে একজনকে সামনে পাইয়া হাত দুইখানা যদুনন্দনের মুখের কাছে নাড়িয়া খিঁচাইয়া বাংলাতেই বলিয়া উঠিলেন, সব পাস-করা ভলেন্টিয়ার বউ রাখ, চরখা কাট; হতভাগা আমায় সুদ্ধু জেরবার করলে রে!

হনহন করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বড়বাবুর ঘরের দরজা ও বারান্দার দিকের জানালা বন্ধ করিয়া সুচারু

সাজিতেছিল। নিশ্চয়ই নিঃশব্দে খানাতল্লাসি চলিতেছে। দরজায় আস্তে আস্তে দুইটি ঘা পড়িল, এবং কম্পিতস্বরে আওয়াজ হইল, হুজুর, দারোগা-সাহেব!

স্থচারু পায়ে পট্টি বাঁধিতেছিল, একটু মৃদু হাস্য করিয়া স্বর যথাসম্ভব পরুষ করিয়া বলিল, সবুর করো, দিক করো মৎ।

মুহূর্তের বিরাম, তাহার পর আরও মগ্নসুরে মিনতি হইল, হুজুর, মেহেরবানি করকে, হাম ঘরকা মালিক হায়, ভলেণ্টিয়ার তো হীরু-বাবুকা ঘরমে—

পট্টির গেরো দিতে দিতে স্থচারু বলিল, আঃ, জালালে পোড়ারমুখী! তোমায় না বললাম কিরণঠাকুরঝি, আমার শেষ না হ'লে আমায় ডেকো না, আর এই পট্টি বাঁধা এক হাঙ্গাম।

দুয়ার খুলিয়া মর্দ্দানা-কায়দায় বুকে হাত জড়াইয়া বলিল, দেখো, চিনতে পারতা হায়? গোঁফ দেখকে ডরতা, ও কি, তুই যে নির্বাক হয়ে গেলি কিরণঠাকুরঝি! দেখ কাণ্ড ছুঁড়ীর!

বড়বাবুর বিস্ময়ে নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। অস্ফুটস্বরে বলিলেন, এ কি ব্যাপার!

স্থচারু হাফপ্যাণ্টের কোমরবন্ধটা কষিয়া দিতে দিতে হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, চমৎকার! তোর দাদা সামনে পড়লেও ঠিক অমনই হতভম্ব হয়ে গিয়ে ওই কথাই জিজ্ঞেস করত, আর চেহারাও তো ঠিক করেছিস, মায় মাথার টাকটি পর্যন্ত! কই, পরচুলার সঙ্গে টাক তো দেখলাম না পুঁটলির মধ্যে? পেলি কোথায়? একেবারে অবিকল দাদাটি; দেখিস, বউদিদি না ভুল ক'রে—

বড়বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, আপনি না হীরুবাবুর স্ত্রী?

স্থচারু আরও সজোরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, হীরুবাবুর

ইস্তিরি, দস্তুরিভুক মাস্টার মশাই। সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর কাঁধের উপর একটা প্রচণ্ড চড় বসাইয়া বলিল, ব্র্যাভো! তুই ভাই, সিনেমাতে যা, লুফে নেবে; টকিতেও তুই মাত ক'রে দিবি। উঃ, আমারই সন্দেহ ধরিয়ে দিচ্ছিস, তা অন্যের আর কথা কি! নাঃ, আমি আর লোভ সামলাতে পারছি না, তোর দাদাকে তো কখনও সামনে পাব না, তোর ওপর দিয়েই গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিই, জয়চন্দ্র যেমন নকল পৃথ্বীরাজের ওপর দিয়ে আশ মিটিয়ে নিয়েছিল, আয়—

বিমূঢ় অসহায় বড়বাবুর আর বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না। 'আয়' বলিতে এক পা পিছনে বাড়াইলেন। সুচারু তাঁহার হাতটা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া সামনের চৌকিটার উপর বসাইয়া দিয়া বলিল, দারোগাকা হুকুম নেহি মানতা, ব'স্ এমনই ক'রে। মনে কর্, তুই যেন তোর দাদা, আর আমি যে দারোগা তাও একটু ভুলে যা। এইবার শোন্, দেখুন মশাই, আপনার অত্র স্টেশনের জীবগুলি হচ্ছেন কুয়োর ব্যাং, আর আপনি হচ্ছেন আবার ধেড়ে ব্যাং। ধেড়ে ব্যাং কথাটার ওপর যদি আপনার আপত্তি থাকে তো বুড়ো তোতা বলতেও রাজি আছি, তা নিজে ডানার ব্যবহার ভুলে থাকেন, নতুন বুলি না শিখতে পারেন, আমার স্বামী-দেবতাটিকে অমন ক'রে··· না ভাই, উঠিস নি, আমার দিব্যি, ব'লে নিই দু কথা আরাম ক'রে। এই যে ঠানদি! ওঃ, মাইরি, তোমায় যা মানিয়েছে!

কি বকছিস নিজের মনে? আমি বলি বুঝি পার্ট আওড়াচ্ছে!— তামাক-গিন্নী প্রবেশ করিতেছিলেন, চৌকির দিকে নজর পড়ায় হকচকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মাড়োয়ারী বেটাছেলের মত কাপড়-পরা, বিশাল ভুঁড়ির উপর বড়বাবুর কামিজটা সাঁটিয়া রহিয়াছে; মাথায় লম্বা খানিকটা পাকানো কাপড়ের লিকলিকে পাগড়ি জড়ানো।

সুচারু প্রবলবেগে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, এস এস। উঃ, একেবারে মাড়োয়ারী, আমাদের স্কুলেও এমনটি দাঁড় করাতে পারি নি। আরে, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে! ও যে কিরণঠাকুরঝি পোড়ারমুখী; তোমাকেও ধোঁকা দিয়েছে! তুমি কিন্তু মাইরি, ওঃ, পেটে খিল ধরিয়ে দিলে!

তামাক-গিন্নী আগাইয়া আসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, সত্যি, ধোঁকা হয়েছিল,—সেই টাক, সেই গোঁফ। তাহার পর সন্দেহের ভাবটা কাটিয়া যাওয়ায় তিনিও সুচারুর হাসিতে যোগ দিলেন। হাসির ঝাঁকানিতে জামার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর একটু সামলাইয়া লইয়া বড়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা, নে ওঠ্, অমন বনমানুষের মত ব'সে রইলি কেন? আবাগীর রঙ্গ এক রকম নয় তো! চল্, ওদেরও এতক্ষণ হয়ে গেছে।

ডাক দিলেন, তোদের হ'ল র‍্যা? আয়, একবার দারোগা আর ইষ্টিশন-মাস্টার দেখে যা।

হাসি চলিল।

আর নেকীরাম মাড়োয়ারীও।—বলিয়া সুচারু হাসির চোটে পেট চাপিয়া প্রায় লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

পিকেটার-বেশে বুকিং-ক্লার্কের স্ত্রী আর শালী ছুটিয়া আসিল, মালকোঁচা-মারা, গায়ে বড়বাবুর সাদা পাঞ্জাবি; তাহাদের পিছনে পিছনে পোস্টমাস্টারের দ্বিতীয়া, গায়ে বুধন পানিপাঁড়ের কুর্তা, মাথায় নীল হলদে রঙের পাগড়ি।

একেবারে চরম হওয়ার জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক, বড়বাবু সম্পূর্ণ শক্তি দিয়া মনের ভাব গুছাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, ব্যাপার কি এ! বড়গিন্নী কোথায়?

হাসির একটা তুমুল কোরাস উঠিল; তাহার মধ্যে 'কর্তার বড়গিন্নীকে চাই, পোড়ারমুখীর বুঝি মাথা বিগড়ে গেছে, টাকে জল চাপড়া'-গোছের কতকগুলা ভাঙা ভাঙা কথাও শুনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় মালকোঁচার উপর প্যাণ্টালুনটা টানিতে টানিতে

কিরণলেখা 'আমরণ! কিসের এত গোল?' বলিয়া ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌকির উপর নজর পড়ায় 'ও বাবা গো, দাদা যে!' বলিয়া দুই হাতে প্যাণ্টালুন টানিয়া ধরিয়া স্যাক-রেসের মত খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পড়ি-ও-মরি-গোছের দৌড় দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নাটকের বাকি চরিত্রবৃন্দ একবার চৌকির মূর্তিটির দিকে এবং পরক্ষণেই পরস্পরের রক্তহীন শুকনা মুখের দিকে একবার চাহিল—মুহূর্তমাত্র, তাহার পর সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদ লদগদ করিতে করিতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুট—কেহ খাইল দেওয়ালে ধাক্কা, কেহ চেয়ারে হোঁচট। তামাক-গিন্নী কোয়ার্টার্সের ছোট আধ-ভেজানো দুয়ারের মধ্যে আটকাইয়া গিয়া জালের মধ্যে মাছের মত একটু ছটফট করিলেন, তাহার পর পিছনের মাছেদের ধাক্কা খাইয়া দুয়ার ঝনঝনাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৯

বন্ধুর চিঠি আসিয়াছে, লিখিয়াছে—ভাই সুচু, তোমার পত্র প'ড়ে সুখী হলাম যে, তোমার শিক্ষার ওষুধ ওঁদের রুগ্ন নাড়ীর মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠছে। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে বোঝা যায়, পুরুষ আর যাই হোক, একেবারেই যে অ-বশ্য, তা নয়। জার্মানি থেকে ফিরে এলেও সম্প্রতি সুকোমলবাবুর মধ্যে যে রকম নমনশীলতার পরিচয় পাচ্ছি, তাতে এই ধারণাটাই মনে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে। আমার মনে হয়, পুরুষ আর নারী আমরা পরস্পরকে সাধারণত দূর থেকে এক ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে থাকি, কত সুখের বিষয় হ'ত—যদি আমরা সামনা-সামনি মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের সত্য-দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারতাম। তা হ'লে দেখা যেত—ইত্যাদি।

সুচারু খালি পত্রের প্রথমাংশের উত্তর দিয়াছে—ভাই, দৈবদুর্বিপাকে শিক্ষা-ঔষধের মাত্রা হঠাৎ একটু চড়া হয়ে পড়ায় আপাতত ডাক্তার রোগী উভয় পক্ষই একটু সঙ্কটাপন্ন। বোধ হয় শীঘ্রই কলকাতায় আসছি, সব কথা সামনেই হবে।

যুগান্তর

দুপুর পার হইয়া গিয়াছে, তবে ঠিক বিকাল এখনও হয় নাই। কাল অনেক রাত্রে বর-বধূ আসিয়াছে। বরণ প্রভৃতি প্রাথমিক আচারে হাঁকডাক-গল্পগুজবে এবং তাহার পর খাওয়া-দাওয়ায় অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। বাড়িটা তাই এখন পর্যন্ত দিবাসুপ্ত। নেহাত যদি এক-আধজন জাগিয়া থাকে।

বাড়িটার গায়ে হেমন্তের হলদেটে রোদ, এখানে ওখানে গোটাকতক নারিকেলগাছের আর একটা ঘনপল্লবিত জামরুলগাছের ছায়া। মনে হয়, কয়দিন আগে বাড়িটাতে গায়ে-হলুদের যে ধুম পড়িয়াছিল, তাহারই ছোপছাপ এখনও যেখানে সেখানে লাগিয়া রহিয়াছে। এই গায়ে-হলুদ সেদিনকার হাসি-হল্লা হট্টগোলের মধ্যে ছিল অন্য রকম; আজ কয়েকদিন দূরে পড়িয়া ইহারই মধ্যে তাহাতে স্মৃতির যাদু রং ধরিয়াছে।

বিয়ের জের এখনও শেষ হয় নাই। আজ সকালে দিন ছিল, বউভাতের অনুষ্ঠানটা সারিয়া রাখা হইয়াছে। রাত্রে ফুলশয্যা। পরশু বউভাতের খাওয়ানোর হাঙ্গামা। সদরে রোশনচৌকি বসিয়াছে। বাজানদারেরা দুপুরের ঝোঁকে একটু জিরাইয়া লইতেছিল, আবার নিজেদের বাজনা ধরিল। প্রথমে ঢোল খঞ্জনি; তাহার পর একজন সানাইয়ে একটানা ফুঁ দিয়া সুরের একটা স্রোত বহাইয়া দিয়া গেল, তাহার উপর ওস্তাদ মূল সানাইয়ে রাগিণীর বিচিত্র লহরী সৃষ্টি করিয়া চলিল।

যেন বীচি-চপল স্রোতই বটে। এক এক সময়, যেমন হেমন্তের এই রকম একটা উৎসবক্লান্ত ম্লান দিনে, মনে হয়, এ কবেকার একেবারে ভুলিয়া যাওয়া সময়ের মধ্য হইতে কত হাসিকান্নার টুকরা ভাসাইয়া

আনিয়া, অল্প একটু সময়ের জন্য চোখের সামনে দুলাইয়া নাচাইয়া আবার নিজের প্রবাহের বেগে মিলাইয়া গেল।

আজিকার স্রোতে এমনই ভাবে হঠাৎ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার এমনই উৎসব-দিনের গোটাকতক বিচ্ছিন্ন কাহিনী ভাসিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া এই কঠিন বাড়িটার কিছু কিছু অংশ গলিয়া মিলাইয়া পরিবর্তিত হইয়া গেল। আজিকার দিনে যাহারা সুখে দুঃখে বাড়িটা মুখরিত করিয়া আছে, তাহারা নিদ্রিত রহিল; কিন্তু একটুর মধ্যেই সেই পরিবর্তিত মায়াগৃহে কবেকার বিস্মৃত একটা আনন্দ-চপলতা সাড়া দিয়া উঠিল। কত মুখের কত রকম ভাষা, কত সব ভঙ্গী; কত রকম চোখ, তাহাতে কত কৌতুকের কি সব বিচিত্র চাহনি; কত রকম পায়ের কত ভঙ্গিমায় চলা!

তাহাদের অনেকেরই চলা শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারাও তাহাদের কণ্ঠস্বরের সে সুর, চাহনির সে অমৃত, গতির সে ছন্দ হারাইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজ যেই সেদিনকার মত সানাইয়ের করুণ সুরে বাড়িটার সর্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিল, অমনই প্রত্যক্ষের সমস্ত কঠিনতা, সত্যের সমস্ত গ্লানি বিলুপ্ত হইয়া গেল, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তর্হিত হইয়া গেল, যাহারা জীবিত আর যাহারা গত, সবাই তাহাদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার সেই কয়টি দিনের উৎসবদীপ্ত চাঞ্চল্য লইয়া আজ দুইটি স্বপ্নাবিষ্ট চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল।

আজ বধূ আসিয়াছে—মীরা; নূতন যুগের নূতন নাম, নূতনবিধ সজ্জা। পায়ে জরির কাজ করা মখমলের লক্ষ্ণৌয়ী নাগরা; নীচের হাতে হালকা স্বর্ণাভরণ; কানে দুইটি হীরার টপ ছাড়া মুখমণ্ডল মুক্ত; আর ভরা বয়সের সেই পূর্ণ মুখখানিতে একটা সপ্রতিভ ভাব, যাহা নিতান্তই যেন এই স্বাধীনতা-যুগের বিজয়কেতন। বধূ আই. এ. পাস।

সেটা ছিল লাবণ্যপ্রভার দিন। আজ যেখানে রোশনচৌকি বসিয়াছে, সেদিন সেইখানে সাঁচ্চার ঝালর দেওয়া পাল্কি নামিল। কচি, সবে খেলাঘর হইতে বাহির হইয়া আসা, আলতা-পরা দুইখানি পা এক থালা দুধে ধোয়াইয়া দুধে-আলতা করা হইল। তাহার পর শাশুড়ীর সেই কোল, নথ-পরা ঘোরালো মুখের সেই প্রসন্ন আহ্বান, এস মা লক্ষ্মী আমার!

তাহার পর বরণের পালা। সেটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, যেন কালিকার কথা, যেন কাল মীরার বরণের পাশে পাশে পঞ্চাশ বছর আগেকার এই বাড়ির সেই আর একটি বরণও হইয়া গিয়াছে। ওইখানে একটা কাঞ্চন-ফুলের গাছ ছিল, সেটা নাকি অনেক বরণের সাক্ষী, তাহার তলায় বর-বধূ দাঁড়াইল। চারিপাশে উচ্ছল আনন্দের একটা মিশ্র কোলাহল; বাজনার শব্দে, হাসির হিল্লোলে, বড়দের হুকুমের পুরু আওয়াজে, ছেলেমেয়েদের আবদারের স্বরে যেন মাখামাখি পড়িয়া গিয়াছে। ওর মধ্যে একটা কথা স্নেহের গভীরতায় খুব স্পষ্ট, কালের গায়ে দাগিয়া বসিয়া আছে।—

ওগো, তোমাদের একশো বার বলছি, ওই বাজে মেয়ে-আচারগুলো শিগগির সেরে নাও, মা আমার রোদে ধূলোয় সারা হয়ে এসেছেন, আর দাঁড়াতে পারেন না।

সে শ্বশুর আর সে শাশুড়ী কেহ কি পায়? মনে হইলেই হাত দুইখানি কপালে গিয়া ঠেকে, চোখে জল ভরিয়া আসে।

পিসশাশুড়ীর সেই ঝঙ্কার, নে বাপু, তোর নতুন শ্বশুরগিরি ফলাতে হবে না; আমাদের আচার সবই বাজে।

পাশে একজনের বোকার মত কথা, বাজেই তো; আমারও ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধ'রে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে, ও ঠাকুরপো! র'স, এখনও ঘরে ঢোকে নি, এরই মধ্যে—

সেই এক হাসি! ছোট বড় কেউ আর বাদ রহিল না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মনটা এ যুগে ফিরিয়া আসে, স্বপ্নস্নাত ঘুমন্ত পুরীতে সানাইয়ের সুর হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে, তাহার পর অতীতের সেই সেদিনের সানাইয়ের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

বরণশেষে দেখার ভিড় পড়ে, মুখ দেখা, গড়ন দেখা, ভূষণ দেখা।

না রাঙাগিন্নী, বউয়ের সেরা বউ এনেছ বাছা; আহা, কি আঙুল গা, যেন আগুনের শিখে! কেহ বলে, যেন চাঁপার কুঁড়ি! একজন কচি গলায় বলে, নখগুলো কত রাঙা দেখেছ মা—টকটকে নটকানের মতন!

এর সঙ্গে খুব ভাব হইয়াছিল, অনেক কথা মনে পড়ে, কত শপথ করিয়া আতর পাতানো! কিন্তু—

শাশুড়ী বলেন, আশীর্বাদ কর, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে বেঁচে থাক্— এই। রূপ আর কি? সুখের ভারে আওয়াজ ভারী হইয়া পড়ে। হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলেন, এই রতনচুড় দিয়েছে, এই তাবিজ আর এই কণ্ঠি। মুখটা তোল তো মা।

দিব্যি দিয়েছে, দেবেই তো, এমন প্রতিমের মত মেয়ে, সাজিয়ে দেবে না গা?

আতরের কথাও মনে পড়ে, আর নোলকটাও চমৎকার দিয়েছে মা, সত্যি।

সবাইয়ের আবার সেই হাসি, চুপ কর্ পাগলী, এত গয়নার মধ্যে ওর চোখে ঠেকল কিনা নোলক!

কে বলিয়াছিল, নোলকে মুখখানি খুব খুলেছে কিনা, যেন সকালের পদ্মফুলটি! নাম কি হ'ল গা?

শাশুড়ী বলিলেন, লাবণ্যপ্রভা।

শ্বশুরবাড়ির লোকে নামে যেন একটা সুর বসাইয়া দেয়। আঙুর

মুখে দিয়া লোকে যেমন ধীরে ধীরে চাপিয়া রসটা চারাইয়া লইতে থাকে, প্রশ্নকর্ত্রী সেইরকমভাবে নামটা লইয়া একটু নাড়াচড়া করিল, লাবণ্য-প্রভা, লা—ব—ণ্য—প্র—ভা, লাবণ্য, বাঃ, চমৎকার নামটি, দিব্যি !

সেদিনকার আদরের বধূ আজিকার বধূর দিদিশাশুড়ী ; কোথায় সেই লাবণ্য, কোথায়ই বা সে প্রভা ?

যা কোন কালেই চিরস্থায়ী নয়, তাহার জন্য দুঃখ নাই ; দুঃখ হয়, সে সব ধরনের প্রশংসাও আর নাই। আজ সকালে মীরাকে দেখিবার সময় একজন বলিল, একেবারে হাল ফ্যাশানের ব্লাউজ়টি, সবচেয়ে নতুন ছাঁট, দিব্যি !

অমন নিটোল গড়ন, অমন পটের ছবির মত মুখ, কাহারও একটা মিষ্টি তুলনা দিবার মুরদ হইল না ; কত তো ঠাকুর-দেবতা রহিয়াছেন—দুর্গাপ্রতিমা, লক্ষ্মীঠাকরুণ, রাইগ্রামের রাধারাণী ; কত ফুল, কত কি ! হাল ফ্যাশানের ব্লাউজ় ! শুনিলেও গা জ্বালা করে।

যাক, নূতন যুগের নূতন রীতি ; অমন হয়ই। সে যুগে যাহারা দিদিশাশুড়ী ছিল, তাহারাও নাতি-নাতনীর বিয়েতে সব জিনিস নিজের মনের মতন করিয়া পায় নাই। নাতবউয়েরা মাথায় তোলা-খোঁপা, সিঁথির নীচে অর্ধেক কপাল জুড়িয়া তেলে-গোলা সিঁদুর, আর চোখে টানা কাজল পরিয়া আসিত না বলিয়া দুঃখ করিত। সময়টা যেন হাওয়া, বহিতে বহিতে নিজের গন্ধ হারাইয়া ফেলে, আবার নূতন গন্ধ সঞ্চয় করিয়া চলে। মানুষ ঠিক থাকিলেই হইল। পায়ে জুতা দিয়া আসুক, কিন্তু মীরা মেয়েটি বড় ভাল। জুতা কি চিরকালই পরিবে ? কোলে একটি হইলেই কোথায় যাইবে জুতা, কোথায় যাইবে ব্লাউজ়, যে কয়টা দিন কোল খালি থাকে—

আজ সকালের মধ্যেই কতজনের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে।

দিদিশাশুড়ী তো যেন কতদিনের খেলার সাথীটি। নাতি যেমন হাসি-খুশি ভালবাসে, ঠিক তেমনটি হইয়াছে। আর হাসিটিও চমৎকার, কেমন ঘাড়টি বাঁকাইয়া লয় সঙ্গে সঙ্গে, কেমন মুক্তার সারির মত দাঁতগুলি! হাঁ, ওই আবার এক একেলে রোগ, পান খাইবে না। ধরুক গিয়া দাঁতে ছোপ, তাই বলিয়া বউ-মানুষ পান খাইবে না? এ আবার কোন্ দেশী কথা? আজ ফুলশয্যা, এই ব্রতটি ভাঙা চাই, নাতিকে টিপিয়া দিতে হইবে।

একটু কানাঘুষা চলিয়াছে, কনে যেন একটু বেহায়া! এত খোলাখুলি ভাব, ঘোমটায় চোখের অর্ধেকটাও ঢাকা পড়ে না, কথা পড়িবার আগেই হাসি!

নেত্য-ঠাকুরঝির ঠোঁটে ক্ষুর, অতক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া উঠিবার সময় বলিয়া গেল, কই গো রাঙাগিন্নী, এতক্ষণ বসলাম, কনে-বউ দেখালে না তো? লোকে বলে, যেন কতকালের পুরোনো বউ ঘরে এল, বয়েস হয়েছে কিনা!

দিদিশাশুড়ীর গায়ে লাগে, ভাবে, বলুক গিয়া লোকে। শ্বশুরবাড়ির কি আবার নূতন পুরানো আছে? এ কি এক জন্মের সম্বন্ধ? জন্মাইবার আগে হইতেই স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর, জা সব ঠিক হইয়া আছে। বাপ-ভাইয়ের বাড়ি, সে তো পরের বাড়ি; সেখান হইতে আসিয়া নিজের ঘরকন্না বুঝিয়া লওয়া; অবস্থাগতিকে কেহ দুই দিন আগে আসিল, কেহ দুই দিন পরে। আসিয়াই যে নিজের ধন, নিজের জন চিনিয়া লইল, সেই তো সেয়ানা মেয়ে। মেয়েমানুষের শাস্ত্রই তো এই।

বাঁশী অব্যাহত প্রবাহে বাজিয়া চলিয়াছে, সুরের মধ্যে কেমন একটা মালাবদলের ভাব। শুধু যে মানুষেরই মালাবদল, তাহা নয়,

অশোক-মীরারই নয়, যেন এযুগ-সেযুগের মধ্যেও মালাবদল, গলাগলি, মেশামেশি আজ।

আজ ফুলশয্যা না? ইহারা যে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে! কেমন ননদ-জা সব? মীরাকে দিয়া মালা গাঁথাইবে না? এদের সব ভাল, ওইটেই কেমন এক বদ প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বলিলেই বলে, সেকালে দুধের বাছা কচি মেয়ে সব ঘরে আসত, অতশত বুঝত না, তাদের দিয়ে সব করানো যেত। আজকাল ডাগরটি হয়ে সব শ্বশুরবাড়ি পা দিচ্ছে, ওসব করতে চায় না।

কি যে কথা!

না, মেয়েরা সব গলাবন্ধ বুনুক, পায়ের জুতার জন্য কার্পেট বুনুক, গলার মালা গাঁথিয়া কাজ নাই। কোথাকার কে মালিনী বেদেনী মালা গাঁথিয়া দিবে, লগ্নক্ষণে সেই মালা গলায় দেওয়া,—এই করিয়াই আজকাল যত অনাসৃষ্টির ছড়াছড়ি, প্রায়ই পুরুষদের সব নোঙর-ছেঁড়া ভাব। এ একটা অলক্ষণ যে! কে মনে কি ভাব লইয়া মালা গাঁথিয়া দেয়, কে বলিতে পারে! ওইজন্য বিয়ের মালাতেও সেকালে বর-কনেকে একটি করিয়া ফুল লাগাইয়া দিতে হইত; উদ্দেশ্য দোষ খণ্ডানো। সেকালে তো কাহারও আর বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না!

না, সেই দুধের বাছা কচি মেয়েদের লজ্জাশরম কিছু ছিল না! তাহারা উঠানের মাঝখানে শ্বশুর শাশুড়ী ভাশুর সব একত্র করিয়া ঢং করিয়া মালা গাঁথায় লাগিয়া যাইত আর কি!

না বাপু, একালের তোমরা যতই বুদ্ধিমান ভাব নিজেদের, কোন ব্যাপার তলাইয়া বুঝিবার মত বুদ্ধিসুদ্ধি তোমাদের নাই; আর যদি হক কথা বলিতে হয় তো তোমাদের একালের ছেলেমেয়েই সব বিয়ে করিতে আসে যেন দুধের বাছা, এসব দিকের কিছু জ্ঞান নাই, কলেজ-স্কুল

ঘাঁটিয়াই সব আক্রান্ত। এই অশুই তো একটা নমুনা, কে বলিবে—ছেলেটার কাল পারাইয়া পরশু বিবাহ হইয়াছে ?

সেকালের ছবি ফুটিয়া উঠে, ফুলশয্যার মালা গাঁথা।

জামরুলতলার এই ঘরটা তখন অত বড় ছিল না, ওর জায়গায় দুইটা ছোট ছোট ঘর ছিল ; তাহার মধ্যে ওদিকেরটা একটেরেয় ছিল বলিয়া সেটাতে কাহারও বড় নজর পড়িত না, নিরিবিলি থাকিত।

এখন কি আর সব কথা মনে পড়ে ! দুপুরবেলা, বড়দের মধ্যে বসিয়া ছিল শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, আরও কে সব। কে আসিয়া তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গেল—মলের ঝমর ঝমর শব্দ, শাশুড়ীর ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিমুখে চাহিয়া থাকা, এখন বুঝা যায়, সেটা গুমরের দৃষ্টি। তাহার পর মনে পড়ে, জামরুলতলার সেই ঘরের মধ্যে ফুলের মেলা—শিউলি, গোলাপ, দোপাটির রাশি, আরও কত সব, কলকের মধু-মধু গন্ধটা এখনও নাকে লাগিয়া আছে। ঘরে ঢুকিতেই টগর-ঠাকুরঝির গম্ভীর হইয়া কথা, ডিম ফুটতেই তেড়ে-ফুড়ে যে আমার দাদাকে বিয়ে করতে এলি, ফুলের মালা গাঁথতে শিখেছিস ? ঘাবড়াইয়া গিয়া তাহার কাঁদ-কাঁদ হইয়া উত্তর, আমি বে করব বলি নি তো। ঘরসুদ্ধ সকলের হাসি, ছাত যেন ভাঙিয়া পড়িবে।

দশ বছরের ছোট মেয়ে, ছলছলে তাহার চোখ, ঘরের মধ্যে দুষ্টামিতে ভরা কতকগুলি মুখ, সবগুলা হাসিতে এলাইয়া পড়িল, এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে।

গোড়ে গাঁথায় সেই প্রথম হাতে-খড়ি।

ফুলশয্যার কোন কথাই মেয়েরা সারাজীবন ভোলে না। কিন্তু তাহারই মধ্যে একটা ব্যাপার মনে হয় যেন এই কাল কি পরশুর কথা। সেই এক রকম জবরদস্তি করিয়াই মুখ ফিরাইয়া ঘোমটা খুলিয়া প্রশ্ন, আমার মালা কই ? পরাতে হবে না ?

কে উত্তর দেয় ? সেই জোর করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকা।

কত খোশামোদ, প্রবঞ্চনা, অভিমান ! বেশ, বোঝা গেল আমায় পছন্দ হয় নি।

উত্তর দিতে বহিয়া গিয়াছে।

আচ্ছা, আর তিনবার বলব, মাত্র তিনটি বার। পরাও মালা, পরাও মালা, পরাও—আচ্ছা, আর দুবার। দুবার হয়ে গেল ব'লে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর একবার বলব, এই শেষ, না শোন তো আমার অকল্যাণ হবে। বেশ তো।

কোন্‌টা পরবে ?—জীবনে সেই প্রথম কথা।

রেকাবিতে তাহার নিজের হাতের গাঁথা মালা ছিল। আসিবার সময় কাপড়ের মধ্যে চুরি করিয়া ননদের নিপুণ হাতে তৈয়ারি একটা মোটা গোলাপফুলের ধুকধুকি দেওয়া গোড়ে আনিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছিল। সেইটার উপর লোভ না হইয়া যায় না।

আহাহা, এতই বোকা আমি ? এইটে, আর কোন্‌টা !—সেই বোনের গাঁথা মালাটি স্বামী তুলিয়া ধরিল।

তাড়াতাড়ি মালাটা গলায় পরাইয়া দিয়াই পাশ-বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে কি হাসি ! ফুল-ছড়ানো বিছানায় হতভম্ব বরের চোখের নীচে হাসিতে কম্পমানা কিশোরীটিকে স্পষ্ট যেন দেখা যাইতেছে। হঠাৎ অমন দুষ্টামির বুদ্ধি যে কোথা হইতে জুটিল !

ছেলেবেলায় যখন কেহ বলিত, মেয়েটা হাঁদা হবে, ঠাকুরমা বলিতেন, র'স, মেয়েমানুষ, কপালে সিঁদুরের বাতি জ্বললেই মাথায় বুদ্ধির ঘর আলো হয়ে যাবে।

তাই ওইরকমভাবে আলো হইয়াছিল আর কি ! এর সাজাও হইয়াছিল ; এর পর আর বাহির হইতে আনা মালা গলায় দিতে চাহিত

না। দেরাজে ফুল আনিয়া লুকাইয়া রাখিতে হইত; রাত্রে বিছানায় বসিয়া সত্ত সত্ত মালা গাঁথিয়া দিতে হইত। ইশারা ছিল, যে দিন ফুল যোগাড় হইত না আগেই জানাইয়া দিতে হইত। জামার পকেট ভরিয়া রাশিকৃত ফুল আসিয়া হাজির হইত।

এক এক সময় মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়; হঠাৎ যেন এত নিবিড়ভাবে পাওয়া অতীতটা ঝাপসা হইয়া যায়; বর্তমানটাও থাকে না, সব লুপ্ত করিয়া আসিয়া পড়ে কেমন একটা অবসাদ। একটা জীবনের বসন্ত হইতে শরৎ পর্যন্ত সবই শেষ হইয়া গিয়াছে; সামনে মরণের শীতের হাওয়া, এই কথাটাই যেন হেমন্তের পাণ্ডুর লিপির মধ্যে কোথায় লেখা রহিয়াছে।

বাঁশীতে আবার ফুঁ পড়ে। তরতরে স্রোত, তাহাতে কোন শতদলের পাপড়ি যেন ভাসিয়া আসে, শ্বশুরবাড়ির সেই প্রথম কয়টা দিন, একবাড়ি লোকের মধ্যে মিলনের সেই হাজার রকম ফন্দি, একটু চকিত দেখা, একটু হাসি, একটু স্পর্শ, যা লাভ—

কই, আজকালকার বর-কনেদের মধ্যে সে রকম যেন আঠাই হয় না, তা একালের ছেলেমেয়েরা যতই না কেন গুমর করুক। বিয়ে করিতে হয় করে, ওই পর্যন্ত। বাপ-মা বিবাহ দিয়া খালাস, বর-কনে মন্ত্র আওড়াইয়া খালাস, ভাজেরা শালী-শালাজ-ননদেরা প্রীতি-উপহার লিখিয়া খালাস। এখন কোথায় নূতন কনের নেশায় মন মাতিয়া থাকিবে, কিন্তু অশুর কথাবার্তায় চলাফেরায় তাহার একটুও আঁচ পাওয়া যায় কি? মীরারও ওই রোগ, বেশ হাসিখুশি, আমোদ-আহ্লাদ, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মনের কোথাও যে আসল লোকটির ভাবনার রঙ ধরিয়াছে, এমন তো মনে হয় না; সে হইলে আর দিদিশাশুড়ীর পাকা চোখকে এড়ানো যাইত না। যেন

হচ্ছে হবে, ও তো হাতের পাঁচ—এই ভাব। এই তো জোড়া-গাঁথার সময়, এ সময়টা অমন ঢিলাঢালা ভাবটা ভাল নয় তো! এইজন্যই সেকালে হাতের তৈয়ারি মালা, হাতের সাজা পান, এই সব করিয়া প্রথম ঝোঁকেই ভাল করিয়া মিলাইয়া দিত।

না, সে নিজে যখন বাঁচিয়া, তখন প্রথম নাতির বিয়েতে একটা পুরানো রেওয়াজ নষ্ট হইতে দিবে না। মীরা উঠুক, ঢের ঘুম হইয়াছে। ননদ জায়েরা ফুল আনিয়া দিক, মীরা মালা গাঁথুক। লজ্জা চলিবে না, গাঁথিতে হইবে।

এ কি ঘুম অনাসৃষ্টি!

একালের দরদী দিদিশাশুড়ীর আর বসিয়া থাকা চলিল না। আহা, একালের আপন-ভোলা দম্পতি, কত দিক দিয়াই যে এরা বঞ্চিত!

উঠিতেই একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে গেল, যেন ওপাশের কোণের ঘরটায় সন্তর্পণে দুয়ার খোলার আওয়াজ হইতেছে। এত লুকাচুরি করিয়া কে দুয়ার খোলে! চাকর-দাসী কেউ ঘরে ঢোকে নাই তো! কাজের বাড়ির ভিড়, গহনাপত্র কাপড়-চোপড় যেখানে সেখানে ছড়ানো গোঁজড়ানো রহিয়াছে। নাঃ, এই অলক্ষণে ঘুমে একটা কাণ্ড ঘটাইবে।

ঘরটা একেবারে আড়ালে পড়ে, আর দুই পা যাইলেই ওদিক দিয়া নীচের দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে, একেবারে খিড়কির পানে। কে মানুষটি দেখিতে হয় তো! আর একটু আড়াল হইয়া বসিতে হইল।

সিঁড়িতেও যেন পায়ের খসখস শব্দ, থামিয়া থামিয়া খুব সতর্ক উঠিবার আওয়াজ। সর্বনাশ! এ যে চাকর-দাসীর সঙ্গে একজোট করিয়া চুরির ব্যবস্থা! ডাকাতিও হইতে পারে। এই ভাবেই তো সেবারে বোসেদের বাড়িতে ডাকাতি হইয়া গেল। আর ওদিকে ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে নাক ডাকার ধুম!

বাহিরের ঘরে পাশা পড়িয়াছে; কিন্তু কে গিয়া খবর দেয়? ঝিটা পর্যন্ত কাছে নাই। কিন্তু এ রকম করিয়া চুপচাপ থাকাও তো চলে না, এদিকে চেঁচাইতে গেলেই যে আসিয়া টুঁটি টিপিয়া ধরিবে। তা হোক, এতগুলা লোকের প্রাণ, গহনাগাঁটি—

দুয়ার আরও একটু খুলিল, কব্জার একটা টানা মিহি আওয়াজ হইল। আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, একেবারে তাড়াতাড়ি তিন-চারটা ধাপ। না, আর দেরি করা নয়, বুঝি সব যায়!

সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবার পূর্বেই আধ-ভেজানা দুয়ার গলিয়া লঘু পাদক্ষেপে মীরা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, এবং একবার এদিক ওদিক চাহিয়া জামরুলের ঝোপে রেলিঙে ভর দিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

সিঁড়ির শব্দটা আবার জাগিয়া উঠিল—জুতার খসখসানি। মীরা চকিতে চাহিয়া ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিল, গালের আধখানা পর্যন্ত ঢাকা রহিল।

এদিকে ভয়ের জায়গায় কৌতূহল আসিয়া মনটা দখল করিয়া বসিয়াছে। কাণ্ডটা কি? একটা সমস্যা যে!

সমস্যার মূর্তিমান সমাধানের মত নাতির শরীরের উপরের ভাগটা হঠাৎ বারান্দার শেষে সিঁড়ির উপর আবির্ভূত হইল।

অবাক করিল! আর ওই অশোক, সাত চড়ে কথা কয় না, সে কিনা খিড়কির বনবাদাড় এঁটো-শকড়ি ছাইগাদা ঠেলিয়া—, আর এই নিযুতি দুপুরে কখনই বা ওদের মতলব ঠিক হইল? এখন এরা করিতেই বা চায় কি? দেখ দেখি কাণ্ডখানা!

খানিকটা দূরে যে মূকাভিনয় হইতে লাগিল, তাহাতেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। নাতি সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় আসিল, ঘরের অর্ধমুক্ত

দুয়ারটি ভেজাইয়া শিকল চড়াইয়া দিল, তাহার পর চোরের মত চারিদিক দেখিয়া লইয়া বধূর পাশ ঘেঁষিয়া পিঠের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার রেলিঙের উপর গলা বাড়াইয়া নীচের দিকটা দেখিয়া লইল।

কি সব কথা হইতেছে; খানিকটা দূরেও, আর চাপা গলায়, শোনা যায় না; তবে কথা যে বেশ হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহই নাই।

ঠাকুরমা এদের ব্যাপার দেখিয়া কৌটা হইতে মুখে পান গুল পুরিয়া দিয়া হাসিতেছিল। উপরে উপরে সব গোবেচারী, আর ভিতরে ভিতরে একালের এঁদের এই কীর্তি! সেকালের বড়াই আর রহিল কোথায়? তিনটে রাতও হয় নাই চার চোখ এক হইয়াছে, ইহারই মধ্যে এত মতলব, এত লুকাচুরি, গলাগলি!

নাতির বাম হাতটা নাতবউয়ের কাঁধের উপর উঠিল। ঠাকুরমা এদিকে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ইচ্ছা হয়, বলে, ওরে, করিস কি? এখনও ফুলশয্যে হয় নি; ফুলের শয্যের আগে যে গায়ে গা ঠেকতে নেই; মনুর আমল থেকে পদ্ধতি চ'লে আসছে, তোরা কি কিছু মানবি নি? শাস্ত্র-টাস্ত্র সব রসাতল দিবি? ততক্ষণে বাম হস্তটি ঘোমটায় উঠিয়াছে।

ঠাকুরমা ওদিকে পান আর গুল-দোক্তার রসে মুখ বোঝাই করিয়া একলাই চাপা-হাসি হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছিল। হাসির চোটে চোখে অশ্রু ঠেলিয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে ঝাপসা। হাসির বেগের মধ্যেই আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিয়া যখন চাহিল, অশোক তখন শিকলটা খুলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে নামিয়া যাইতেছে। চোর, ডাকাত, যা বলা যায়।

আবার এক ঝলক হাসিতে উচ্ছ্বসিত অশ্রুর ধারা মুছিয়া ঠাকুরমা বলিল, বাবা বাবা, হার মানলাম; তোদের যুগের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার, কটা ঘণ্টার আর তর সইল না? সে যুগের গুমর আমার দুটো দণ্ডও টিকতে দিলি না, বলিহারি!

বাদল

চাণক্য যখন লেখেন, 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ', সে সময় নিশ্চয় আমাদের বাদলের মত ছেলে জন্মগ্রহণ করিত না। ওই একফোঁটা ছেলে, সবে বোধ হয় দুইটা বৎসর পুরা হইয়াছে, অথচ বাড়িসুদ্ধ এতগুলা লোক ওর পিছনে হিমসিম খাইয়া যাইতেছি! ওর ঠাকুরমার কাছে ওর সাতখুন মাপ, এমন কি, প্রতিদিন সত্য সত্য সাতটি করিয়া খুন করিলেও। কিন্তু তাঁহার মুখেও কখনও কখনও শোনা যায়, না, আমাদের কম্ম নয়; আমরা হার মানলাম বাপু, ও ছেলেকে শাসনে রাখবার জন্যে একটা নেটেড়া রাখতে হবে।

অর্থাৎ লালনের ব্যবস্থাটা বাদলের সম্বন্ধে ক্রমেই অচল হইয়া উঠিতেছে। তবে লেঠেড়াতেও যে তাহাকে বেশ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ, তাহার দৌরাত্ম্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং তাহার মা প্রভৃতি দুই-একজন বড়দের মধ্যেও গোটাকতক অ্যামেচার লেঠেড়া গড়িয়াই উঠিয়াছে; কিন্তু বাদল তো এখনও ঠিক যে বাদল সেই বাদল!

আমি তো 'তোর যা ইচ্ছে কর্ বাপু' বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, এক রকম নিরাশ হইয়াই; কারণ ছোট ছেলেদের, দেশের ভবিষ্যৎ আশাদের, শরীর এবং মনের তত্ত্ব এবং এই দুইটিকে উৎকর্ষিত করিবার উপায় সম্বন্ধে মোটা মোটা দামী ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি বই হইতে এত পরিশ্রমে যে জ্ঞান এবং ধারণা আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা বিলকুল ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার আটাশ টাকার পাঁচখানা অতিকায় বইয়ের কোন পাতাতেই বাদলের কোন অংশ ধরা পড়ে না। কেতাব-লেখকের পাকা ঝুনো মাথায় যে সবের ধারণাও কস্মিনকালে

আসিতে পারে না, এমন সব নিত্যনূতন অনাসৃষ্টির মতলব এই একরত্তি ছেলেটির মাথায় ঠাসা। এই চরিতাখ্যানের আদ্যোপান্ত পড়িলে বুঝা যাইবে যে, চেষ্টার আমি কসুর করি নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছি, এ ছেলেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা খালি পয়সার শ্রাদ্ধ, সময় আর উৎসাহের অপব্যয়। ওর যাহা অভিরুচি করুক গিয়া।

তবে ইহার মধ্যে বাড়ির লোকদের বেশ একটু দোষ আছে। প্রথমত—মা। তাঁহার একটা গুমর, ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে কোন বেটাছেলে কিছু বুঝে না ; জোর করিয়া বলেন, একেবারে কিচ্ছু নয়, আমার কাছে লিখিয়ে নাও এ কথা।

আমাদের সম্বন্ধে এ রকম হীন ধারণায় রাগ হয়, বলি, তুমি কি বলতে চাও মা, এই সাত টাকা, দশ টাকা দামের বইগুলো সবাই খাতিরে প'ড়ে কিনছে ? এতে ছেলেদের—

দুধ জ্বাল হতে পারে পুড়িয়ে। থাম্, আর বকিস নি বাপু।

এর পর আর বকিতে ইচ্ছাও হয় না।

কিন্তু ইহাতেও তেমন কিছু ক্ষতি নাই। ক্ষতি হইতেছে এইখানে যে, বিশেষ করিয়া বাদলের সম্বন্ধে আবার দুনিয়ার মেয়েপুরুষ কেহই কিছুই বুঝে না, এক তিনি ছাড়া। কি করিয়া এই ধারণা মাথায় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ও এক মহাপুরুষ হইবে, বাস্, ওর সাজা নাই, বকুনি নাই, এমন কি ওর দুষ্টামিতে বাধা দেওয়ারও হুকুম নাই বলিলে চলে।

অত্যাচারের আতিশয্যে এক-এক বার যে রাগ দেখান, সেটা একেবারে মৌখিক, আদরেরই রূপান্তর।

সেদিন শিশুদের অনুকরণপ্রিয়তা ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ পড়িতেছি, হঠাৎ ছেলেমেয়েদের পড়িবার ঘরে হাসিকান্নার একটা মস্ত হট্টগোল উঠিল। একটু পরে বাম হাতে দক্ষিণ হাতটা

ধরিয়া রাণু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। দেখি, কব্জির উপর স্পষ্ট চারিটি দাঁতের দাগ, লাল হইয়া উঠিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কে করেছে ?

বাদল, রাক্কস ছেলে।

হুঁ, তা বুঝেছি। কোথায় সে, চল্ দেখি।

ঘরে গিয়া তদন্তে জানা গেল, গৃহশিক্ষক জগন্নাথবাবু যাওয়ামাত্র বাদল আসিয়া তাঁহার আসনটি অধিকার করিয়া বসে এবং শিক্ষকতার বাজে অংশগুলিতে সময় অপব্যয় না করিয়া একেবারে সার অংশ লগুড়-চালনায় লাগিয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা জাঙিয়া-পরা এই কচি মাস্টারের অভিনব মাস্টারি খানিকটা আমোদচ্ছলে উপভোগ করিল; কিন্তু তাহার অব্যর্থ সন্ধানের চোটে আমোদের ভাগটা ক্রমেই সাংঘাতিক রকম কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন রাণু লগুড়টি কাড়িয়া লয়, তাহার পর এই কাণ্ড।

বাদল একপাশে দাঁড়াইয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপ্রতিভ-ভাবে সব শুনিতেছিল। হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিয়া গটগট করিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুখটা তুলিয়া বলিল, কাকা, হাম হাম।

রাণু বলিল, অমনই ছেলে ঘুষ দিতে এলেন, ভারি চালাক!

ঘুষ লইবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। বাদলের হাতটা ধরিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া একটু রাগতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কে একে ওদের পড়বার ঘরে যেতে দিয়েছিল, আমি না পইপই ক'রে বারণ ক'রে আসছি ?

মা বলিলেন, যেতে আর দেবে কে? ও কি কারুর হুকুমের তোয়াক্কা রাখে নাকি? তোমাদের এক অদ্ভুত ছেলে হয়েছে, রাজার রেয়ৎ নয়, মহাজনের খাতক নয়, মনে হ'ল ভেতরে রইল, মনে হ'ল বাইরে টহল দিতে গেল; কে ওকে রুকছে বল!

বলিলাম, না, দিনকতক একটু সজাগ থাকতেই হবে মা ; দরকার হয়, ওর মার সংসারের পাট করা একেবারে বন্ধ ক'রে দাও দিনকতকের জন্যে। তোমরা বোঝ না, এটা ওদের নকল করবার বয়স কিনা, যত সং জিনিসের নকল করতে শিখবে ততই মঙ্গল। এখন যদি বাইরে গিয়ে জগন্নাথবাবুর হুঙ্কার, বেত আছড়ানি, কিংবা ঠাকুর আর চাকরের নিত্য ঘুষোঘুষির নকল করতে যায় তো ও একটি আস্ত খুনে হয়ে উঠবে, এই ব'লে দিলাম। এখন ওদের মনটা—

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, জানি, আমার কোন কথাই তোমাদের পছন্দ হয় না। কিন্তু এ তো আমার নিজের মনগড়া কথা নয়। এ যে ফরাসী লেখকের বই থেকে তুলে বলছি, সে যে-সে লোক নয় ; বইটার এর মধ্যে সাত-সাতটা সংস্করণ—

মা যেন উদ্ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আঃ, তুই থাম্ দিকিন বাপু ; কচি ছেলে নকল করতে শেখে—এ কথা জানবার জন্যে নাকি আমায় ফারসী আরবী বই ওটকাতে হবে, গেলাম আর কি! এই নকলের চোটেই তো গেরস্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, কিন্তু করা যায় কি? এই তো এক্ষুনি ওর মায়ের ঘরে কীর্তি ক'রে এল। ঘরের মেঝেয় এক বাটি দুধ আর একটা ঝিনুক রেখে বেচারী কি কাজে একটু এদিকে এসেছে। আর আছে কোথায়! লুসীর কোল থেকে তার ছানাটা টেনে নিয়ে গিয়ে, থেবড়ে ব'সে, সেটাকে চিত ক'রে কোলে ফেলে, মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরে দুধ খাওয়ানোর সে ধুম দেখে কে! ঘরের মধ্যে কেঁউ-কেঁউ শব্দ কিসের? গিয়ে দেখি, ওম্মা! ছেলে দুধের সমুদ্রের মধ্যে ব'সে, আর ওই কাণ্ড! থমকে দাঁড়াতে, মুখের দিকে চেয়ে 'বাদো ডুডু'। —তার মানে উনি হয়েছেন মা, লুসীর ছানা হয়েছে বাদল, মার বাদলকে দুদু খাওয়ানো হচ্ছে। বাঁচাতে বাঁচাতেও বউমা এসে দিলে ঘা-কতক

বসিয়ে। এখন বল, চাও এমন সৎকাজের নকল? ওকে বাইরে রাখবে, কি ওর জন্যে একটা খোঁয়াড় গড়বে, তোমরাই ঠিক কর। বাড়ির সবাই তো হেরে ব'সে আছি।

আমি বলিলাম, আমার উদ্দেশ্য তুমি ঠিক ধরতে পার নি মা, ওর কাছে তো ভাল মন্দ ব'লে প্রভেদ নেই। কাকে নকল করতে হবে, কোন্‌টা নকল করতে হবে, কি ভাবে নকল করতে হবে, আমাদেরই বেছে দেখিয়ে দিতে হবে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছে খাটাতে গেলেই গলদ। চোখে পড়লে আমাদের ধমকে ধমকে শুধরে দিতে হবে। বেশ তো, আজকের এই দুটো ব্যাপারই এখন টাটকা রয়েছে, এই দুটো নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

বাদল মার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপরাধীর মত নিজের কীর্তিকাহিনী শুনিতেছিল, আমি হাতটা ধরিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া চোখ মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, বাদল!

আজ ঝোঁকটা বড় বেশি পড়িয়াছে, বাদলের ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া মার ভাবগতিকটা লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বিষণ্ণ মুখ, সামলাইয়া-লওয়া কান্নার দুইটি বিন্দু অশ্রু চক্ষে ঠেলিয়া আসিয়াছে। আস্তে আস্তে ধরা গলায় ডাকিল, নিন্নী!

বাস্, মা গলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইয়া আদরে চুম্বনে যতক্ষণ না মুখটাতে হাসি ফুটাইতে পারিলেন, ততক্ষণ নিরস্ত হইলেন না।

আমি নিরাশ হইয়া বলিলাম, ওই, স—ব মাটি করলে! কি, না একটু গিন্নী ব'লে ডেকেছে। মনের ওপর নিজের দোষের জ্ঞানটি দিব্যি জ'মে আসছিল, তুমি সব ভেস্তে দিলে। ওই জিনিসটি হচ্ছে অনুতাপের অঙ্কুর। তোমরা নষ্ট করেছ ওকে—তুমি আর দাদা মিলে।

মা ধমক দিয়া উঠিলেন, ক্ষ্যামা দে বাপু, ওইটুকু ছেলের নাকি আবার অনুতাপ, প্রাশ্চিত্তির—অমুঙ্গুলে কথা শোন একবার! ক'রে নিক যত দুষ্টুমি করবে ও; শেষ পর্যন্ত একটা মহাপুরুষ হবেই ব'লে দিচ্ছি। তোরা সব লক্ষণ চিনিস না।

এই অবস্থা। চুপ করিয়া ভাবিতে থাকি; দুঃখ হয়, এঁরা বিজ্ঞানের দিক দিয়া ঘেঁষেন না, মেথড বুঝেন না—ইনি আর দাদা। এ বিষয়ে দাদার গাফিলতি আরও মারাত্মক; কেন না, তিনি আবার বিচার এবং শাসনের অভিনয়ের মধ্য দিয়া সেটা প্রকাশ করেন।

২

কোর্ট হইতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাদার ঘরে তাঁহার দৈনন্দিন ঘরোয়া কোর্ট বসিয়া গিয়াছে। এক পাল বাদী—রাণু, আভা, ভোম্বল, রেখা, আরও সব। ফরিয়াদী মাত্র একটি—বাদল। সে বিচার-পদ্ধতির সনাতন ধারা লঙ্ঘন করিয়া জজের কোলে বসিয়া লেবেঞ্চুস খাইতেছে এবং অবসরমত মাথা সঞ্চালন করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছে।

নানা রকম ছোট বড় নালিশের চোটে ঘরের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। রাণুর হাতে দাঁতের ছাপ, আভার মাথা-ভাঙা কাচের পুতুল, রেখার ছেঁড়া বই, ভোম্বলের ছেঁড়া চুল—এক প্রলয় কাণ্ড! চৌকাঠের বাহিরে লুসীও তাহার পাঁচটি নিরীহ, বিপন্ন, অত্যাচারগ্রস্ত শাবক পাশে লইয়া দীন নয়নে বিচারাসনের দিকে চাহিয়া আছে। দেখিলে এক-এক বার মনে হয় বটে, তাহার সপরিবারে ওই লেবেঞ্চুসটির দিকে লোভ; কিন্তু সে বেচারী ছাপোষা, বাদলের অত্যাচারে উদ্বাস্তু হইয়া ন্যায়ের দ্বারস্থ হইয়াছে, এ অনুমানেও কোন বাধা দেখি না।

এমন জবরদস্ত মকদ্দমা দাদা দুই কথায় শেষ করিয়া দিলেন। পকেট

হইতে কাগজ মোড়া খান চার-পাঁচ বিস্কুট বাহির করিয়া ফরিয়াদীকে প্রশ্ন করিলেন, এগুলো সমস্ত পেলে আর দুষ্টুমি করবে না বাদল ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, মন্দ বিচার নয়। আমারও একটু দুষ্টুমি করবার লোভ হচ্ছে। কাল আবার দুষ্টুমি করলে জরিমানার পরিমাণ ডবল হয়ে যাবে তো ?

দাদা বলিলেন, ও এই সব করেছে ব'লে বিশ্বাস হয় ? ওর চোখ দুটো দেখ্ দিকিন।

বেঁটে, চওড়া চওড়া গড়ন, একটু ঘাড়ে-গর্দানে, আর এই রকম ধড়ের উপর প্রকাণ্ড একটা মাথা, এগুলো সবাই বাদলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুইটি সত্যই একটু গোল বাধায় বটে, যদি বাদলের সঙ্গে অষ্টপ্রহর পরিচয় না থাকে। আর সে রকম পরিচয় দাদার বড় একটা নাইও।

সকাল সকাল দুইটি খাইয়া আপিস যান, প্রায় সন্ধ্যার সময় আসেন। ডাক পড়ে, বাদল !

শান্ত-শিষ্ট শিশুটি আসিয়া উপস্থিত হয়। দাদার জন্য বিশেষ করিয়া পরানো পরিষ্কার জামা গায়ে, হাতমুখ যত্ন করিয়া মোছানো। আসিয়াই গোটাকতক চুমা উপঢৌকন, প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া একবার 'একা' একবার 'আনু'-র নাম উচ্চারণ—মানে, রেখা ও রাণুর হাতে আজ সমস্ত দিনটা নির্যাতন গিয়াছে। সান্ত্বনাস্বরূপ লেবেঞ্চুসপ্রাপ্তি।

তারপর জ্যাঠার সেবা। জুতা রাখিয়া দেওয়া, চটি আনিয়া তাঁহার পা দুইখানি পাতিয়া বসাইয়া দেওয়া, হাত-পা ধুইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানো ; কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন কোন্ বাড়ি না কোন্ বাড়ির ছেলে।

দাদা তৈয়ার হইলে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া দাদার জলযোগের বন্দোবস্তের জন্য মোতায়েন হওয়া, পানের ডিবা হাতে করিয়া আবার প্রবেশ।

তাহার পর বসিয়া বেশ পরিপাটিভাবে দাদার জলখাবারের রেকাবির ভার লাঘব করা।

এই অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায়, বাদল দাদার সঙ্গে খানিকক্ষণ হুড়াহুড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পাশে শুইয়া পড়িয়াছে। দাদা আস্তে আস্তে রগের উপর করাঘাত করিতেছেন এবং বাদলের শান্ত অধরে তাহার 'ভাত আসছেন, আমি খাচ্ছেন'-শীর্ষক স্বরচিত প্রিয় গানটি মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া আসিতেছে।

আমি বলিলাম, ওর চোখ দুটো তো মারামারির জন্যে হয় নি, ওকে বাঁচাবার জন্যে হয়েছে, বাঁচাচ্ছেও বেশ। কিন্তু ওর হাত পা আর দাঁত— যা ওর অস্ত্র, সেগুলো দেখে তোমার কোন সন্দেহের কারণ আছে? যদি থাকে তো না হয় বাঁখারিগুলোও আনিয়ে দিই।

দাদা হাসিয়া বলিলেন, শুনছ বাদল, বাদীরা নিজের মুখেও নালিশ করলে, আবার ভাল উকিলও রেখেছে। এখন তোমার কি বলবার আছে, বিশেষ ক'রে বাঁখারি সম্বন্ধে?

বাদল দাদার হাঁটু-ঘোড়ার উপর ঘোড়সওয়ার হইয়া বসিয়া ঘোড়াকে চালাইবার নানা উপায় লইয়া ব্যস্ত ছিল; বাঁখারির কথা শুনিয়া সড়াৎ করিয়া নামিয়া পড়িয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমরা তাহার এই হঠাৎ তিরোভাবের কারণ না ধরিতে পারিয়া তাহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় বাদল একখানা চওড়া, প্রায় হাত-খানেকের বাঁখারি লইয়া প্রবেশ করিল।

চৌকাঠ না পার হইতেই ছেলেমেয়েগুলা কলরব করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, ওটা ওর তরোয়াল, ওই দিয়ে আমার কপালে মেরেছিল, এই দেখ। কেহ বলিল, ওটা আমার রাঁধার হাতা, আমায় দিয়ে দিতে বল। সবচেয়ে ছোট সন্তানবৎসলা আভা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল,

না গো না, ওটা হাতা নয়, তরোয়াল নয়, আমার ছেলে, ওর কাপড় কেড়ে নিয়েছে বাদলা।

বাদল এসবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সটান দাদার কোলে গিয়া বসিল এবং তাহার অচল ঘোড়াটিকে গতিবান করিবার জন্য তাহার এই নূতন আমদানি করা সূক্ষ্ম চাবুকটি উঁচাইয়া ধরিল।

দাদা হাসিয়া উদ্যত চাবুকটি ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, আহা বাদল, ঘোড়া দুটো সমস্ত দিন তোমার জ্যাঠাটিকে ব'য়ে ব'য়ে এলিয়ে পড়েছে, আর এর ওপর ঠেঙিয়ে কাজ নেই।

বাদল দাদার মুখের দিকে চাহিয়া নালিশের সুরে বলিল, ডুট্টু।

দাদা বলিলেন, আহা, কিছু খায় নি কিনা অনেকক্ষণ, তাই দুষ্টু হয়েছে। তোমায় একটা ভাল ঘোড়া কিনে দোব 'খন, কি বল?

আমায় বলিলেন, কালকে ছুতোরকে একটা কাঠের ঘোড়ার কথা ব'লে দিস তো।

বলিলাম, দোহাই, আর উপসর্গ বাড়িয়ে কাজ নেই। যা সরঞ্জাম সব মজুত—

দাদা শেষ না করিতে দিয়া বলিলেন, না, কাজ কি? আমার ঠ্যাং দুটো ওই আখাম্বা বাঁশ-পেটা থাক আর কি! এখন ওই ঝোঁক চেপেছে সেদিন রমনায় ঘোড়দৌড় দেখে।

বলিলাম, ছুতোরকে ব'লে দিতে বিশেষ আমার আপত্তি নেই, শুধু ভয় এই যে, আর একটা ঝগড়ার ঘর বাড়বে। আর, তা ছাড়া কচি ছেলের ঝোঁকমত সব বিষয়েই যোগান দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়, তাতে ওদের মন একটা নির্দিষ্ট গতি পায় না। এ কথাটা বেশ সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন বিখ্যাত জার্মান লেখক ফন—

দাদা বিরক্তভাবে বলিলেন, তোর ওই কেতাবী বুলি রাখ্ দিকিন।

ছেলেপিলের মন এখন হাজার পথে হুহু ক'রে দৌড়বে, ও মাঝ থেকে পাহাড়-প্রমাণ কেতাবের লাইন ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান হ'ল! বাংলা কথা হচ্ছে, ছোট ছেলের ঘোড়ার শখ হয়েছে, তাকে একটা কিনে দিতেই হবে। না দাও, আমার হাঁটু, তোমার কাঁধ, চেয়ারের হাতল, ছাতের আলসে, যা স্থবিধে পাবে ঘোড়া ক'রে ব'সে থাকবে। শেষকালে একটা কাণ্ড ঘটাক আর কি—

আভা বলিল, বারে, ও আমাদের মারলে, আর ওকেই বিস্কুট দেওয়া হ'ল; আবার একটা ঘোড়া পাবে—

রেখার কথায় ইহার মধ্যেই বেশ ঝাঁজ হইয়াছে। একটু পিছনে ছিল, সেই আড়াল হইতে বলিল, ও ছেলে কিনা; আমরা সব বানের জলে ভেসে—

দাদা রাগ দেখাইয়া বলিলেন, কে রে? রাখী বুঝি? মেয়ে হতে গিছলে কেন?

রেখা আর একটু আড়ালে সরিয়া গিয়া বলিল, বাদলের মার খাবার জন্যে।

দুইজনেই হাসিয়া উঠিলাম। দাদা বলিলেন, একেবারে পেকে গেছে হতভাগা মেয়ে। নাঃ, এরা বেজায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তোদের বিচার ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়া।

ডাকিলেন, বাদলবাবু, এদিকে এস তো, লক্ষ্মীছেলে।

বিচারের আশায় বাদীমহলে একটু চঞ্চলতা, ফিসফিসানি পড়িয়া গেল। বাদল দাদার ঈজি-চেয়ারের পিছনে গিয়া দুলিয়া দুলিয়া বিস্কুট খাইতেছিল এবং রেখার সহিত লুকাচুরি খেলা করিতেছিল; ডাক শুনিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাদা রাণুর হাতটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এ কি করেছ বল তো? এ তোমার কে হয়?

গড়পড়তা রোজ এ রকম চার-পাঁচটি বিচার-অভিনয় হওয়ায় বাঁধা গতটি বাদলের খুব রপ্ত। দাদার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে খাসা নির্বিকারভাবে নিজের কান দুইটি ধরিয়া বলিল, ডিডি অয়।

প্রণাম কর।

হুকুমের পূর্বেই সে অর্ধেক ঝুঁকিয়াছিল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ধির স্বাক্ষরস্বরূপ রাণু একটা চুমা খাইল। বাঁধা রীতির আর একটা অঙ্গ।

এই রকম ভাবে দোষের গুরুত্বলঘুত্বনির্বিশেষে পাঁচটি মকদ্দমার এই একই পদ্ধতিতে বিচারকার্য শেষ হইলে দাদা বলিলেন, কেমন, তোমাদের আর কোন দুঃখু নেই তো? বাদলের সাজা মনে ধরেছে? আর কোন নালিশ নেই?

ও বয়সে ভাব করিবার ইচ্ছাটাই প্রবল, সেইজন্যই হউক, কি ইহার বেশি বিচারের আশা নাই বলিয়াই হউক, সবাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। এক রেখা ছাড়া। তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিটা বেশ তীক্ষ্ণ। বলিল, আবার কাল—

দাদা হাসিয়া বলিলেন, বেশ, কালকের কথা কাল দেখা যাবে। এই চারখানা ক'রে বিস্কুট নাও সব; বাদল যদি দুষ্টুমি করে, একটু ক'রে ভেঙে দিও, ঠাণ্ডা থাকবে। যাও, বিচার শেষ।

না বলিয়া পারিলাম না, এই একঘেয়ে নকল-বিচারে ওর মনে কোনও দাগ বসাতে পারে না, এইজন্যেই—

দাদা তাঁহার সেই হাসির হিল্লোল তুলিয়া বলিলেন, দাগ বসাতে হ'লে তো ওরই বিদ্যে শিখতে হয় আমাকেও, রাণুর কব্জিটা দেখেছিস তো? আমার দাঁতে অত জোর-টোর নেই বাপু।

সবাই চেঁচামেচি করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাদল দাদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, দাত্তা, দুচী?

দাদা আমায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন ; অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, হ্যাঁ জ্যাঠা, লুসী। আমি যতদূর দেখছি, শৈলেন—

বাদল আধ-খাওয়া বিস্কুটটা লুসীর দিকে বাড়াইয়া ডাকিল, আঃ, আঃ।

লুসী আপনার বাচ্চাগুলিকে ঘাড়পিঠ হইতে ঝাড়িয়া দিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে উপস্থিত হইল।

দাদা বলিয়া যাইতেছিলেন, এই তো গ্রামে নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব, দল পাকাতে পেলে সব ছেড়ে তাইতে মেতে ওঠে, কতটা দুঃখের বিষয় বল্ তো? তুই হাসছিস যে?

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তিনিও সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। বাদল তাঁহার বিচারের ত্রুটিটুকু পূরণ করিয়া দুই হাতে দুইটি কান ধরিয়া লুসীর সামনের থাবা দুইটির উপর মাথা দিয়া পড়িয়া আছে এবং লুসী তাহার দীর্ঘ জিহ্বা দিয়া পরম ক্ষমাভরে তাহার মাথা পিঠ চাটিয়া চাটিয়া একশা করিয়া দিতেছে।

দাদার বিচারের সদ্য সদ্য আলোচনা করিবার এমন চমৎকার সুযোগটা আমি নষ্ট হইতে দিলাম না। হাসিতে হাসিতেই বলিলাম, তোমার বিচারের ফার্স টা যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল, বাদল নিখুঁতভাবে সেটা পুরিয়ে দিলে দাদা।

৩

পরের দিন সকালে দাদার ঘরে বাদলের কথা হইতেছিল। মা বলিতেছিলেন, ওর তো সর্বজীবে সমান ব্যবহার হবেই, ওসব লক্ষণই আলাদা। স্থির হয়ে এক-এক সময় যখন ব'সে থাকে, ঠিক পরমহংস-দেবের মত মুখের ভাবটি হয়, দেখিস না! তিনিও নিশ্চয় ছেলেবেলায়

ঠিক অমনটি ছিলেন। আর তা ছাড়া অমন একটা বড় তীর্থে জন্মেছে, ও একটা মহাপুরুষ না হয়ে যায় না, তোমরা সব—

এমন সময় বারান্দায় চটাস করিয়া একটা প্রচণ্ড চড়ের আওয়াজ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাদলের ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিবার আওয়াজ।

মা তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন, ও কি বউমা, ছেলের গায়ে হাত? আর ওই রকম হাত? দিন দিন যে কসাই হয়ে উঠছ!

বউমার চাপা গলায় ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যাইতে লাগিল, আমি তো আর এই ডানপিটে চোরকে নিয়ে পারি না মা; দেখবে এস, রান্নাঘরে কি কাণ্ডটা করেছে হতচ্ছাড়া ছেলে।

দৃশ্যটি নিশ্চয় খুবই মনোজ্ঞ, সবাই উৎসুকভাবে উঠিয়া গেলাম। সরজমিনে বাদল মুখের মধ্যে চারিটি আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ঝোলে সবুজ হইয়া গিয়াছে, বাম হাতের মুঠার মধ্যে একমুঠা মাছ। কান্না থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার মাকে অতিক্রম করিয়া এদিকে আসিয়া পড়িবার মত সাহস যোগাইয়া উঠে নাই।

দাদা একেবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ও মা, তোমার সাধুপুরুষের সর্বজীবে সমভাবের আর একটা নমুনা দেখ, এইখানে এস, ওই জলের টবটার আড়ালে।

সেখানটায় হঠাৎ কাহারও দৃষ্টি যায় না, আর বাদল কিংবা লুসী ভিন্ন কেহ প্রবেশ করিতেও পারে না। সেই অন্ধকার কোণে ঝকঝকে একখানি রেকাবিতে আধ সের পরিমাণ মাছের মুড়া একটা, রেকাবির এধারে ওধারে কাঁটাকুটা দুই-একটা পড়িয়া আছে। লুসী আরম্ভ করিয়াছিল, এখন সভয়ে গুটিসুটি মারিয়া দীন নয়নে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

দাদা হাসিতে হাসিতে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, আবার মাজা রেকাবিতে তোয়াজ ক'রে। ও বাদল, ওটি আমাদের নাতবউ নাকি?

দার্শনিক হিসাবে বাদল একজন স্থবিধাবাদী। বুঝিল, আর দেরি করা নয়। যেন মস্ত একটা ইয়াকি চলিতেছে, যাহার মর্ম শুধু দাদা আর সে বুঝে, এইভাবে দাদার পানে চাহিয়া, নাতবউ বলিয়া খুব বড় করিয়া একগাল হাসিয়া পা বাড়াইল, কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মার চোখের দিকে নজর পড়ায় থমকিয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রেখা হাসিয়া বলিল, ও সাধুপুরুষ! তোমার আবার চুরিবিদ্যে!

মার ধমক খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল।

আমরা সরিয়া গেলেই বউমাকে আর রোখা যাইবে না; অন্তত রুখিবার পূর্বেই লুসীঘটিত এই নূতন আবিষ্কারের ঝাল তিনি ঝাড়িয়া লইবেনই। মা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বাদলকে বাহির করিয়া আনিলেন। পরমহংসদেব হইতে একেবারে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার, নাতি তাঁহাকে একটু অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়াছে বইকি।

কাহারও দিকে না চাহিয়া বলিলেন, ও আমার ননীচোরা, তাঁরও চুরি ক'রে না খেলে পেট ভরত না। নে, আর জটলা করতে হবে না সব, হাতে-নাতে পাট সেরে নে।

এই রকম একটা কাণ্ডের পর খুব খানিকটা হল্লা-হাসি হয়, যোগদান করি, তারপর বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। একটা গোটা ছেলের ভবিষ্যৎ, সোজা কথা নয় তো! এদিকে দেশের এই দুর্দিনে—

মাকে বলিলাম, দেখ মা, এ ঠিক হচ্ছে না। এতে ক'রে নাতি তোমার পরমহংসদেবও যত হবে, ননীচোরাও তত হবে, আর বাবার রোঘো-ডাকাতও খুব হবে। এঁর ঠ্যাঙ, ওঁর ধড়, তাঁর মুড়ো নিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার যা হয়ে উঠবে, তা দেখবার মত হবে নিশ্চয়। তার চেয়ে দিন-কতক আমার হাতে দাও। বেশ তো, সাধুপুরুষ চাও, সেই রকম ভাবেই—

মা বলিলেন, তোর কাছে সব ছাঁচ আছে নাকি যে, ঢালাই ক'রে যেমনটি চাইবি গ'ড়ে টেনে তুলবি? তা রাখ্ না বাপু, তোর কাছেই। এতগুলো লোককে নাজেহাল ক'রে তুলেছে, পারবি তো একা সামলাতে?

দাদা বলিলেন, কিছু না, ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে আপাতত; কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকবে 'খন।

বলিলাম, ঘোড়ার খেয়ালটাই মাথা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ওই জিদ ভাঙা দিয়েই আরম্ভ করব।

আর ওও তোমার প্ল্যান ভাঙা দিয়ে শেষ করবে, এই ব'লে রাখলাম। কি বাদল, পারবি তো?

দাদা হাসিতে লাগিলেন।

সেইদিন হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম। ঠিক হইল, এক খাওয়ার সময় ছাড়া বাদল সমস্ত দিন আমার কাছে থাকিবে। সন্ধ্যা হইতে দাদার চাইই; অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হইলাম, কিন্তু সমস্ত দিনের অপকীর্তির বিচারের ভারটা দাদার হাত হইতে তুলিয়া লইলাম। বলিলাম, ও ব্যাপারটাকে অত হালকাভাবে নিলে চলবে না, বিচারটা বেশ সূক্ষ্মভাবে ওর সমস্ত দিনের কাণ্ডকারখানার আলোচনা ক'রে করতে হবে। রোজকার রোজ ওর মনের কোনও বৃত্তিকে একটু একটু ক'রে উসকে দিতে হবে, আবার কোনটাকে বা অল্প অল্প ক'রে নিবিয়ে আনতে হবে।

দাদা হাসিয়া বলিলেন, মন্দ হয় না; তা হ'লে শিগগির মনোবৃত্তির একটা টেম্পারেচার-চার্ট তোয়ের ক'রে ফেল্। রোগীটিকে বাইরের ধুলো বাতাস থেকে বাঁচিয়ে কোন্ ঘরে পুরে রাখবি?

রাগিয়া বলিলাম, ঘরে পোরবার দরকার আছে বলছি কি? হাসবে খেলবে, একটু মারামারিও করবে; এমন কি, চুরিও করতে পারে মাঝে মাঝে, তবে একটা সিস্টেমের মধ্যে। স্পার্টানরা তো তাদের ছেলেদের চুরি করতে—

দাদা আবার হাসিয়া উঠিলেন, অর্থাৎ ছেলেটাকে তুই একটা সিস্টেমেটিক চোর করতে চাস? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দাদাকে পারিবার জো নাই।

পরের দিন সতরো টাকা দামে দুই ভলুম বই আনিতে দিলাম। অথর আমেরিকার একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক; সমস্ত জীবন অবিবাহিত থাকিয়া কেবল শিশুমনের আলোচনা করিয়াছেন।

মা শুনিয়া বলিলেন, নে, আর জ্বালাস নি বাপু, যে বিয়েই করলে না, ছেলেপিলের মুখ দেখলে না, সে শিশুদের বিষয় কি বুঝবে? ঢঙ একটা!

দাদা বলিলেন, কেন, এক সময় সে নিজে তো শিশু ছিল!

এসব ঠাট্টায় কান দিলে চলে না। বই দুইখানা সযত্নে মলাট দিয়া আলমারিতে তুলিলাম। আমার অন্যান্য বইগুলাকেও ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাজাইয়া রাখিলাম।

দুই-চারি দিন গেল। আমার কেতাবের ছত্রগুলি লাল নীল দাগের উর্দি পরিয়া আমার সাহায্যের জন্য মোতায়েন হইয়া উঠিল। প্রথমটা বাদলকে একচোট অগাধ মুক্তি দিয়া দিলাম, বাড়িতে অষ্টপ্রহর সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল। মা বলিলেন, এই কি তোর শাসন হচ্ছে? এর চেয়ে সে যে ঢের ভাল ছিল।

মাকে ছকটা বুঝাইয়া দিলাম, হোমিওপ্যাথি ওষুধে প্রথমে রোগটা একচোট বাড়িয়ে তোলে। আমি ওর সমস্ত দোষগুণগুলো ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলে ওকে ভাল ক'রে চিনে নিচ্ছি আগে, সপ্তাখানেক লাগবে।

মা বলিলেন, তদ্দিনে বাড়ির অন্য ছেলেপিলেদের আর চিনতে পারবে না কিন্তু, এই ব'লে দিলাম। আজ ঘুমন্ত আভার মুখে পাউডারের সমস্ত কৌটো গেছে, দম আটকে যায় আর কি! ওই গো, আবার বুঝি কি কাণ্ড বাধালে! ওরে, কে আছিস, দেখ্ দেখ্।

চার দিন গেল, ছয় দিন গেল, দশ দিন গেল, চিনিতে অত্যধিক দেরি হইতেছে, উত্তরোত্তর শক্তও হইয়া উঠিতেছে যেন—দুষ্টামিতে বাদলের নিত্য নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্য। ক্রমে দেখিতেছি—এবেলা এক রকম, ওবেলা এক রকম। নালিশের চোটে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। দাদা বলেন, শৈলেনের কাছে যা। মা বলেন, শৈলেনের কাছে যা, কিছু বললে আমাদের ওপর চটবে। বউদের মুখেও ওই কথা। আবার তাঁহাদেরও নিজের নিজের নালিশ আছে।

অথচ আমি চটিব না, একটুও চটিব না ; কিন্তু সে কথা বলি কি করিয়া? ছেলেপিলেদের মধ্যে যে নালিশ করিতে আসিতেছে, সেই উল্টা মার খাইয়া গেল, এমন ব্যাপারও ঘটিতেছে দুই-একটা। বলি, মাথায় ধূলো দিয়ে দিয়েছে তো দিক দুদিন ; আমায় বই প'ড়ে নেবার একটুও অবসর দিবি নি তোরা?

আসলে ঠিক বই পড়া নয়। বইয়ে দাগ দেওয়া হইতে এখন সমস্ত পাতার উপর ঢেরা কাটায় দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় রাগের মাথায় দুই-একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াও থাকিব। আমার মুখ দিয়া কি ইহারা 'না' না বলাইয়া ছাড়িবে না? এদিকে সপ্তাহখানেক ছুটি বাড়াইব বলিয়া যে ঠিক করিয়াছিলাম, সে সংকল্প ত্যাগ করিয়াছি ; বোধ হয় ছুটি ফুরাইবার সপ্তাহখানেক আগেই চলিয়া যাইতে পারি।

আজ পনরো দিনের দিন। নবীনতম সংবাদ—বাদল বাবার গড়-গড়ায় তামাক টানিতেছিল, বাবার মত ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়া। আভা চোখ দুইটা এতবড় করিয়া আসিয়া খবর দিল, একবার দেখবে এস আস্পদ্দাটা!

একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিলাম, আর তুমি কোথায় ছিলে বাঁদরী? ছোট ভাইটিকে একটু চোখে চোখে রাখতে পার না?

অর্থাৎ আভার হাতেও অভিভাবকত্বের ভারটা ছাড়িয়া দিতে রাজি আছি। বলিলাম, ধ'রে নিয়ে আয় হতভাগাকে।

সেটা দৈহিক সম্ভাবনার বাহিরে জানিয়া নিজেই গেলাম। দেখি, একবর্ণও মিথ্যা নয়। অবশ্য কলিকাতে আগুন নাই, কিন্তু টানার ভঙ্গী নিখুঁত, যায় বাবার কাসিটি পর্যন্ত! বাবার প্রতিবেশী বন্ধু উপেনবাবু আসিলে নলটি বাড়াইয়া দেন, সেটুকুও বাদ গেল না; আমি সামনে আসিতেই মুখ হইতে নলটা সরাইয়া 'খুলো, এতো' বলিয়া হাতটি বাড়াইতে যাইতেছিল, আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মাঝপথেই থামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আমি কানমলা কি ওই রকম একটি ছোটখাটো সাজা দিতে যাইতেছিলাম, একটা কথা ভাবিয়া থামিয়া গেলাম। হঠাৎ মনে হইল, বাদল নিশ্চয় এটা দোষ বলিয়া আগে জানিত না। কেন না, জানিয়া শুনিয়া যে দোষ করা, তাহাতে ধরা পড়িলেই বাদল নিজে হইতেই কান ধরিয়া পূর্বাহ্লেই হাঙ্গামা মিটাইয়া রাখে। তাহা ছাড়া দোষ বুঝিলে আমাকে দেখামাত্রই ভয় পাইত নিশ্চয়ই; 'খুড়ো, এস' বলিয়া এ ভাবে সটকাটা বাড়াইয়া দিতে সাহস করিত না।

আমি এইটিকে নিছক একটি দৈব সুযোগ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। অপরাধটি একেবারে নূতন; কেন না, বাবা কখনও নল বাহিরে ছাড়িয়া যান না, কেমন ভুল হইয়া গিয়াছে। দামী রবারের নল, এখানে পাওয়া যায় না, তাঁহার অত্যন্ত হেফাজতের জিনিস।

এই অপরাধটিকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক। এখন হইতেই অপরাধের গুরুত্বটি মাথার মধ্যে এমন করিয়া ঢুকাইয়া দিতে হইবে, যেন এই জাতীয় অপরাধ সমস্ত জীবনে আর না করে।

নিজের ঘরে লইয়া আসিয়া বাদলকে একখানি মাদুরে বসাইলাম,

এবং সামনে একটি টুলের উপর নলসুদ্ধ গড়গড়াটি বসাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই দেখ্, আর মুখ দিবি ওটাতে ?

এ নূতন ধরনের অভিজ্ঞতায় বাদল একেবারে হকচকিয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িল।

ঠিক ওই ভাবে ব'সে থাক্, বজ্জাত কোথাকার !—বলিয়া আমি শেল্ফ হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে লাগিলাম।

একটু পরে আবার ফিরিয়া তাকাইলাম, বাদল জড়ভরতের মত ঠায় সেই ভাবে বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, দিবি আর মুখ ওটাতে ? পেরেকের মাথায় একটি একটি করিয়া ঘা দেওয়া হইতেছে।

সে সেই রকম মাথা নাড়িল, না।

ব'সে থাক্ ঠিক ওই ভাবে, ওই দিকে চেয়ে।

বইয়ে ঠিক এই ধরনের চিকিৎসার কথা লিখিতেছে ; সেইখানটা খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। বলিতেছে, সাজা কড়া হইবার কোন দরকার নাই ; একটি গাম্ভীর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়া দোষের গুরুত্বটা মাথার মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। বার্লিনের পাঁচটি দুশ্চিকিৎস্য শিশুর কেস দেওয়া আছে ; রীতিমত রেকর্ড রাখিয়া দেখা গিয়াছে, সাত বৎসরের মধ্যে তাহারা সে দোষ আর করে নাই, অথচ সব জার্মান-বাচ্চা—কালে হিণ্ডেন্‌বার্গ, লুডেন্‌ডর্ফ হইবার কথা।

বিবৃতিটি এতই চিত্তাকর্ষক যে, চোখ ফেরানো যায় না। পড়িতে পড়িতে থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু না তুলিয়া তিন-চার বার প্রশ্ন করিলাম, আর দিবি মুখ ওতে ?

উত্তর নাই, না দেখিলেও বুঝিতেছি, সেই রকম ভাবে মাথা নাড়িতেছে।

খানিক পরে সমস্ত অধ্যায়টি শেষ করিয়া বইটা মুড়িয়া রাখিলাম। নিজের পরীক্ষার এই আশু সফলতায় মনে মনে তৃপ্তিবোধ হইতেছিল। বেশ নিশ্চিন্তভাবে 'আর ওটাতে দিবি না তো মুখ, অ্যাঁ ?' বলিয়া ফিরিয়া উঠিয়া বসিলাম।

কোথায় বাদল ? মাদুর শূন্য, টুলের উপর খালি গড়গড়াটা, সটকা নাই।

হাঁকিলাম, বাদল !

ও বারান্দা হইতে উত্তর আসিল, আঁগ্যোন !

ওর বাবার শেখানো ভদ্রতা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাদল ব্যবহার করে।

উঠিয়া গিয়া ব্যাপার যাহা দেখিলাম, তাহাতে তো চক্ষুস্থির !

রবারের নলের আধখানা লইয়া লুসীর বাচ্চারা খেলা করিতেছে, আধখানা ঘোড়ার লাগামের আকারে লুসীর মুখে, বাদলের হাতে তাহার খুঁট দুইটা, মুখে হ্যাট হ্যাট শব্দ চলিতেছে।

লুসী মাংসভ্রমে পরম পরিতোষ সহকারে চিবাইয়া যাইতেছে, এটারও দুইখানা হইয়া যাইতে আর দেরি নাই। বাবার শখের নল, সমস্ত বাজার উজাড় করিয়া বাছিয়া কেনা।

একটুখানির মধ্যেই বাড়িতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বাবা আসিয়া সটকার খোঁজ করিতেই। বউমার নির্দয় প্রহারে বাদলের বাড়ি-ফাটানো কান্না, মার বউমাকে বকুনি ; এর সমস্তটাই এমন দ্ব্যর্থক যে, প্রত্যেকটি কথা আমার উপর একটু বক্রভাবে খাটে ; লুসীর চীৎকার করিতে করিতে গৃহত্যাগ এবং তাহার বাচ্চাদের গৃহের মধ্যে থাকিয়া অসহায়ভাবে চীৎকার।

দাদা ক্রমাগতই বলিতেছেন, বলছি, ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে, সেদিন পই পই ক'রে বুঝিয়ে বললাম।

বাবা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' তিরস্কার লাগাইয়াছেন, তাহার মধ্যে সেকাল-একালের তুলনামূলক ব্যাখ্যান আছে, এ সংসারে তামাক ধরার জন্য আত্মধিক্কার আছে, বিজ্ঞানমাত্রেরই—বিশেষ করিয়া মনস্তত্ত্বের—শ্রাদ্ধ-কামনা আছে।

বলিতেছেন, ভড়ঙের যেন যুগ প'ড়ে গেছে, ছেলে তো আমিও মানুষ করেছি, একটা আধটা নয়—

মা শেষ করিতে দিলেন না; আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন, মুখটা বিরক্তভাবে ঘুরাইয়া লইয়া ঝাঁঝিয়া বলিলেন, ছাই মানুষ করেছ, ওই নমুনা নিয়ে আর বড়াই করতে হবে না।

শিশু-মনস্তত্ত্বমূলক সাতখানি নামজাদা পুস্তকের গ্রাহকের জন্য "স্টেট্স্‌ম্যানে' বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াছি।

কুইন অ্যান

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উড্‌বার্ন সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতেছেন, আসবাবপত্র সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দুইটা কুকুর সঙ্গে যাইবে, গোটা চারেক বিলি হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে একটি ঘুড়ী। সাহেব ওটাকে প্রথম হইতে ওয়েলার জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রবল খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ; যাহাদের কিনিবার ক্ষমতা আছে, বলিতেছে, আরেবিয়ান জাতের হইলে কেনা যাইত। দুই-একজন নন্‌-খিলাফতিস্ট রাজি হইয়াছে, কিন্তু দর উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া সাহেবের কানে উঠিয়াছে, ইহারা নিজেরা ব্যবহার করিবে না, তিনি যাত্রা করিলেই জাত ভাঁড়াইয়া ঘুড়ীটাকে প্রাচ্য করিয়া লইবে, তাহার পর চড়া দামে ছাড়িয়া দিবে।

এদিকে সময় আর মাত্র দিন পনরো-ষোল; মীমাংসা একটা হওয়া চাইই। অথচ সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, ঘুড়ীটা যাহার তাহার হাতে পড়িয়া কষ্ট পায়, একাদিক্রমে দশটা বৎসর একসঙ্গে আদরযত্নে কাটাইল! কি যে করিবেন, ব্যাকুলভাবে চিন্তা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ রায় সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। রায় সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহার হাতের দেওয়া খেতাব, লোকটা খাতির রাখিলেও রাখিতে পারে। সাহেব ভাবিলেন, দেখাই যাক না ভেজে কি না; ঘুড়ীটা তাহা হইলে সুখে থাকে।

রায় সাহেবকে সেলাম পাঠানো হইল। উপস্থিত হইলে অবান্তর নানা রকম কথার পর আসল কথাটা পাড়িলেন। দেখা গেল, ভিজিয়া

থাকাটাই রায় সাহেবদের স্বাভাবিক অবস্থা, বেশি সিঞ্চিত করিতে হইল না। সাহেব যে অন্যের হাতে প্রিয় ঘুড়ীটাকে বিশ্বাস করিয়া দিতে চান না, আর এতগুলা হোমরা-চোমরাদের মধ্যে তিনিই যে সাহেবের বিশ্বাসভাজন বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন, ইহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের যখন সেই রকমই অভিরুচি, তখন তিনি উপহার হিসাবেই সেটিকে লইতে রাজি আছেন, গৌরবের সহিত রাজি আছেন। তবে দাম হিসাবে নয়, শুধু বিলাতে গিয়া তিনি যাহাতে ওই রকমই একটি ঘুড়ী অবিলম্বে কিনিয়া লন, সেজন্য অল্পস্বল্প করিয়া অন্ততপক্ষে হাজার খানেক টাকাও অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রায়-সাহেবোচিত বিনয়ের সহিত একটু তর্কও করিতে ছাড়িলেন না, তা যদি না করেন সাহেব, তো হুজুরের দান দেখে অধীন না হয় সর্বদা হুজুরকে স্মরণ করবে, কিন্তু অধীনকে মনে করায় হুজুরের কাছে থাকবে কি? না, সে হবে না।

উঠিবার সময় রায় সাহেবও আসল কথাটা পাড়িলেন, বার্থ-ডে অনার্সের সময়টা আসছে, হুজুর যাচ্ছেন, আশেপাশেই ক-বছরের মধ্যে পাঁচ-ছটা রায় সাহেব হয়ে গেল, ছ্যাকড়া-গাড়ির মত বেড়ে যাচ্ছে, ওতে আর মান থাকে না। লোকে গালাগাল দেওয়ার জন্যে আজকাল কথাটা ব্যবহার করছে।

সাহেব কথা দিলেন, আগন্তুক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফর্দ দিবার সময় তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন। উঠিবার সময় করমর্দন করিয়া বলিলেন, আমার মস্ত বড় একটা সান্ত্বনা রইল যে, ঘুড়ীটা একজন সমঝদার আর হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ারের হাতে পড়ল। শুনলাম, এ তল্লাটে নাকি এ বিষয়ে আপনার সমকক্ষ আর নেই কেউ।

রায় সাহেব নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, না, তেমন

কিছু নয়, তবে ঘোড়া জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে চড়ার অভ্যাসে আছে, এই যা।

২

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তবে পনরো আনা বাড়াইয়া বলা। বয়স যখন চৌদ্দ কি পনরো হইবে, রায় সাহেব ফোটো তুলিবার জন্য শখ করিয়া একবার একটা টাট্টুতে চড়িয়াছিলেন, একটা মহারাট্টী ব্যবসাদার বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। চড়ার পরমূহূর্ত হইতে ঘোড়াটা বনবন করিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে এ রকম ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে, প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘাড়ের চুল আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল ; সবে নূতন পৈতা হইয়াছে, গায়ত্রীর উপর খুব বিশ্বাস, এক হাতে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, আর এক হাতে ঘোড়ার ঘাড়ের রোমরাশি।

পরে জানা গেল, সেটি সার্কাসের ঘোড়া। সেই যে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকিয়া গেল রায় সাহেবের মনে, সেই হইতে ও জানোয়ারটি সম্বন্ধে চাণক্যের উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছেন, সার্কাসের ঘোড়া বা বাহিরের ঘোড়া বাছেন না, ভাবেন, রেসের ঘোড়া হইলেই বিপদ কম হইত নাকি ? সে বরং আরও বড় করিয়া চক্কর মারিত।

কিন্তু রায়-সাহেবির মোহ, উপায় কি ?

তাহা ছাড়া আরও একটু কথা আছে। নিশ্চিন্ত জীবনের সবচেয়ে যাহা বড় চিন্তা, কিছুদিন হইতে তিনি তদ্দ্বারা নির্মমভাবে আক্রান্ত। পরিবর্ধমান ভুঁড়ি তাঁহাকে হিমসিম খাওয়াইয়া ছাড়িতেছে। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, এর দাওয়াই—বেড়ানো ; সেটা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ওরা রব তুলিয়াছিল, তাহা হইলে ঘোড়ায় চড়ুন। বিশ্রী রকম গরম পড়িয়া কষ্ট বাড়িয়াছে। দোমনা হইয়া কয়েকদিন

হইতে ভাবিতেছিলেন, মন্দ কি! একটা তেমন শান্তশিষ্ট, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসপরায়ণ, বাধ্য, ভব্যসভ্য, নিরীহ, গোবেচারী গোছের ঘোড়া যদি পাওয়া যাইত!

এই সময়টায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তলব করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে দিন চলিয়া গেলেন, সেই দিন বৈকালে সাহেবের সহিস আমির হোসেন ঘুড়ীটাকে আনিয়া হাজির করিল। একটা জিনিস বটে! দীর্ঘ নিটোল শরীর, উন্নত বর্তুল গ্রীবা, বিশাল চক্ষু দুইটি প্রাণের দীপ্তিতে ভরা, এক মুহূর্ত সুস্থির নয়—চনমন চনমন করিতেছে, ক্ষুরের আওয়াজে আর সাজের মসমসানিতে জায়গাটা যেন জাগিয়া উঠিল। আমির হোসেন জানাইল, ঘুড়ীর নাম—কুইন অ্যান।

পারিষদেরা বলিল, হ্যাঁ, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী বটে; গা নয় তো, কাচ—মাছি বসলে পিছলে পড়বে।

অতি মসৃণ গাটার দিকে চাহিয়া রায় সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, হুঁ, তবে আমি তাড়াতাড়ি ওকে কিছু বলছি না। খাক-দাক জিরুক কদিন। ঘোড়ার নিয়মই হচ্ছে, মাঝে মাঝে বেশ দিনকতক বসিয়ে রাখা।

যাহারা ঘোড়ার সম্বন্ধে কিছু বুঝেন, তাঁহাদের বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, ঘোড়ার নিয়ম ঠিক বিপরীত। অভিজ্ঞ আমির হোসেন রায় সাহেবের ভুলটা শুধরাইয়া দিতে যাইতেছিল, পারিষদদিগের এক-জনের চোখ-টিপুনিতে থামিয়া গেল।

রায় সাহেব বিচক্ষণের মত একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, আচ্ছা, ঘোড়া এত মোটা হওয়া কি ভাল—কোনখানে একটু টোল নেই, তোমরা কি বল হে?

দুই-একজন ব্যাপারটা বুঝিল, মাছি পিছলানোর কথাটা রায় সাহেবকে ভড়কাইয়া দিয়াছে। বলিল, আজ্ঞে, ঘোড়া একটু যদি

রোগাশোগা না হ'ল তো কি হ'ল? যদি নিজের মাংস বইতেই হয়রান হ'ল তো সওয়ারী বইবে কখন?

একজন বলিল, আর তা হ'লে তো ঘোড়ায় না চ'ড়ে লোকে গোল বালিশেই চড়তে পারত হুজুর।

রায় সাহেব বলিলেন, দৌড়োয় কেমন আমির হোসেন? মানে, ইয়ে তো বেশ?

আমির হোসেন গর্বের গাঢ়স্বরে বলিল, তীরের মত হুজুর, একটু রাশ আলগা দিয়ে একটুখানি ইশারা, বাস্, আর দেখতে হবে না।

রায় সাহেব বিবর্ণমুখে বলিলেন, আমিও তাই চাই। ভাল কথা, থামাবার ইশারাটা কি? ওর নাম কি, সব ঘোড়া আবার একই ইশারাতে থামে না কিনা; আমি ছেলেবেলায় যে ঘোড়াটায় চড়তাম—

থামানো এক হাঙ্গাম হুজুর, এক-এক বার দেখেছি, রাশ টেনে প্রায় শুয়ে পড়তে হয়েছে সাহেবকে, তবে থেমেছে।

ঘুড়ীটা ছটফট করিতেছিল, পিঠে দুইটা সাবাসির চাপড় কষিয়া আমির হোসেন বলিল, তবে আর বলছি কি, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী একেবারে। তবে একটা বড় দোষ আছে।

রায় সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, কি, কি দোষ? আগ্রহটা চাপিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বেশ বুঝা গেল, অশ্বিনীর গুণের তালিকায় ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইয়া দোষের আশায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমির হোসেন বলিল, এক-এক সময় কি দোষ হয়, কোনমতেই চাল ধরে না তখন।

চাল ধরে না মানে কি? দৌড়ুতে চায় না?

দৌড়ুনো দূরের কথা, বিলকুল নড়তে চায় না। ঝোঁক এক-এক বার দু-তিন দিন পর্যন্ত থেকে যায়। সাহেব কত ডাক্তার দেখালেন, কত—

নড়তে চায় না মানে কি? অনেক ঘোড়া চলবে না, কিন্তু একই জায়গায় ঘুরপাক খাবে, অন্তত সেটুকুও নিশ্চয় চলে তো?

আজ্ঞে না, চারটি নাল পুঁতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, হাজার মারুন, পিটুন, লোভ দেখান, কিছুতেই কিছু হয় না।

রায় সাহেবের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছেন যেন, ভাবটা এই রকম করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তো, পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়বে না? বেশ, এমনই আপাতত তুমিই ফেরি দাওগে রোজ, তবে এই রকম একগুঁয়েমি ধরলে আমায় খবর দিও, শায়েস্তা ক'রে দোব।

আমির হোসেন সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আর দেখ আমির হোসেন, ফেরি করবার সময় তুমি আর ওকে দৌড় করিও না; আপাতত দৌড়ের অভ্যাসটা যাক। আমি ওই পা পুঁতে দাঁড়ানো থেকে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করা, তারপরে একটু একটু কায়দামাফিক দৌড়ুনো, তারপর আরও জোরে, এই ক'রে একেবারে গোড়া থেকে তোয়ের করব। একটি বছরের বেশি লাগবে না।

আমির হোসেন বিস্ময়াভিভূত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, একজন পারিষদের ইশারায় আর একটা সেলাম করিয়া 'যে আজ্ঞে হুজুর' বলিয়া চলিয়া গেল।

৩

ঘুড়ীটা নূতন আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া তিন-চার দিন বেজায় মনমরা হইয়া রহিল। আমির হোসেন ঘুড়ী সহিত এত্তালা করিল, সাহেবকে দেখতে না পেয়ে কিছু খাচ্ছে-টাচ্ছে না হুজুর, তিন দিনেই যেন গ'লে গেছে।

রায় সাহেব বলিলেন, জোর ক'রে খাওয়ানোর দরকার নেই, ওদের সয় না।

একটু থামিয়া বলিলেন, মেহনৎ করাচ্ছ তো?

আজ্ঞে, এত কাহিলের ওপরে—

পারিষদদের একজনের চোখ-টিপুনিতে আমির হোসেন কথাটা আর শেষ করিল না; একটু থামিয়া বলিল, আজ বিকেলে একবার বের করেছিলাম, দেখলাম, নড়তে নারাজ। ভাবলাম, যাক, দুদিন আর ফেরি দোব না, হুজুরেরও মানা আছে।

রায় সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, ওই তো আমির হোসেন, ঘোড়ার মেজাজ বুঝতে তোমার এখনও দেরি আছে। এই তো মেহনৎ নেবার সময়; ঘোড়ার জেদ বাড়তে দিয়েছ কি বিগড়েছে,—ঘোড়ার আর রেয়তের। ও কাজের কথা নয়, সকালে একবার নিয়ে এস, বাছাধন বুঝুন কার পাল্লায় পড়েছেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, তা ব'লে যেন খাওয়াতে জেদ ভাঙতে যেও না, পিঠে সইবে ব'লে যে পেটেও সইবে, তা ভেবো না।—বলিয়া রসিকতায় আবার হাসিয়া উঠিলেন। সকলে যোগ দিল। ঘুড়ীটা মাথা নীচু করিয়া ডান ক্ষুর দিয়া রাস্তা চাঁছিতেছিল, ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া নাক কাঁপাইয়া একটা আওয়াজ করিল।

কি ভাবিল, অথবা কিছু ভাবিল কি না, সেই জানে। রাত্রে দেখা গেল, তাহার অগ্নিমান্দ্যটা হঠাৎ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। চার দিনের না হোক, দিন দুইয়ের আহার সে দিব্য পুষাইয়া লইল এবং বেশ স্ফূর্তির সহিত অঙ্গচালনা করিতে লাগিল। মোটের উপর বেশ বুঝা গেল, ও স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, যাওয়া-আসা, মিলন-বিরহ পৃথিবীতে চিরকালই চলিতেছে, উহার জন্য শোকে ঘাস-জল ছাড়িয়া দিলে শুধু

আত্মনির্যাতনই সার হয়; এবং বোধ করি, এও ভাবিল যে, তাহাতে শুধু দুশমনের মুখেই হাসি ফুটে মাত্র।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত যত রকম ঘোড়ায় চড়িবার সাজগোজ শরীরকে ভারাক্রান্ত এবং জবরজঙ্গ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমস্তই কয়েকদিন পূর্বে কেনা হইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া রায় সাহেব ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া সযত্নে গোলমাল করিয়া সবগুলি পরিধান করিলেন। আজ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার ফোটো লওয়া হইবে, বহুদিনের সাধ। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, একখানা টাঙানো থাকিবে বারান্দায়, একখানা বৈঠকখানায়, একখানা শোবার ঘরে। প্রত্যেক পারিষদ এক-একখানা করিয়া দস্তখত করা ছবি পাইবে। খান-পনরো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

শহর হইতে ফোটোগ্রাফার আসিয়াছে, সাড়ম্বরে ক্যামেরা ঠিকঠাক করিতেছে। রায় সাহেবের মনটি খুব প্রসন্ন; ঘোড়ায় চড়াও হইবে, ফোটো লওয়াও হইবে, আর এদিকে ঘোড়া এক পা নড়িবেও না, চক্কর দেওয়া তো দূরের কথা।

পারিষদেরা সব হাজির; হাসি-ঠাট্টা, ঘোড়া দুরস্ত করার গল্প চলিতেছে। রায় সাহেব বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথার পাগড়িটাতে সাধ্যমত রাজপুতী ঢং ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় আরসিতে ঘুড়ীর ছায়া পড়িল।

রায় সাহেব ঘুরিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার ঘোড়া আমির হোসেন?

আমির হোসেন ঝুঁকিয়া একটি সেলাম করিয়া সহাস্য-বদনে কহিল, হুজুরেরই কুইন অ্যান, রাত থেকে খেয়ে-দেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, চেনা যাবে কমনে থেকে? শুধু একবারটি কয়েছিলাম, দেখিস, মালিক প্রথম সওয়ারি হবেন, ইউ নোটি গেরেল!

শেষের ইংরেজীটুকু ঘুড়ীর উদ্দেশ্যে ; সে শরীর দুলাইয়া দুলাইয়া অতিরিক্ত নাচ লাগাইয়া দিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে আমির হোসেনের হস্তধৃত লাগামে এক-একটা উৎকট ঝাঁকুনি দিয়া নিজের অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করিতেছিল। দাবড়ানি খাইয়া রায় সাহেবের পোশাকের উপর চক্ষু দুইটা ন্যস্ত করিয়া একটা আনন্দধ্বনি সহকারে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

আমির হোসেন বাঁ হাতটা তাহার ঘাড়ের উপর বুলাইয়া বলিল, সবুর, মালিক আসছেন ; লেকিন সাচ্চা চাল দেখানো চাই, হাঁ।

রায় সাহেবের মুখটা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, বেশ বেশ, ভাল কথা। অনন্ত, কাল বলছিলে, একবার চড়বে, না হয় ঘুরে এস না ; দোব ব্রিচেসটা খুলে ? মানে, কথা হচ্ছে, আমার পাল্লায় পড়লে এমন ঢিট ক'রে ছাড়ব যে, খানিকক্ষণ ওর আর পদার্থ থাকবে না, মিইয়ে যাবে ; তখন আর চ'ড়ে সুখ পাবে না।

অনন্ত নামক পারিষদ তাড়াতাড়ি একটু হাতজোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে না হুজুর। ওরে বাবা ! কালকে মিইয়ে ছিল ব'লেই বলেছিলাম চড়ব ; নেহাত পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকছে বললে কিনা !

রায় সাহেব একবার অপর সকলের উপর চোখ দুইটা বুলাইয়া আনিলেন, কেহ চোখ নামাইয়া লইল, কেহ টুপ করিয়া দরজার আড়ালে সরিয়া গিয়া চোখে চোখ ফেলিতে দিল না। কে একজন একেবারে সামনা-সামনি ছিল, ভীতভাবে হাসিয়া বলিল, হুজুরকে বঞ্চিত ক'রে কেউ কি আগে চড়তে রাজি হবে ? হোক কলিযুগ, তবু—

উপায়ান্তর না দেখিয়া রায় সাহেব আরশির সামনে সরিয়া আসিয়া পাগড়িটা খুলিয়া আবার সযত্নে এবং সবিলম্বে চাপিয়া চাপিয়া বাঁধিতে লাগিলেন। আশা, যদি ইতিমধ্যে কিছু একটা হইয়া গিয়া তিনি এ যাত্রা রক্ষা পান ;—ভূমিকম্প, কি অগ্নিকাণ্ড, কি অপঘাত, যা হয় একটা কিছু,

মানটা কোন রকমে যাহাতে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু পাগড়ি বাঁধা পর্যন্ত যথেষ্ট সময় থাকিতেও সেসব কিছুই হইল না; যদিও ইহাতেও কোন সন্দেহ রহিল না যে, সাধের বিপদটি খুবই আসন্ন, তাঁহার ঘোড়ায় চড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। দায়ে-পড়া বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইলেন। নরম আলগা শরীরের মাংস পাতলা করিয়া মাথা ময়দার মত পোশাকের খাঁজে খাঁজে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রথম তো চড়াই একটা সমস্যা। যে পারিষদটি কলিযুগ হইলেও রায় সাহেবকে প্রথম অশ্বারোহণের আনন্দ ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে চায় নাই, সে সামনে আসিয়া বলিল, আপনি তা ব'লে যেন লাফিয়ে চড়তে যাবেন না হুজুর, এই সেদিন অমন বাতে ভুগলেন। তার চেয়ে, আমির হোসেন, তুমি এই বারান্দার পাশটায় এনে দাঁড় করাও, টুপ ক'রে উঠে পড়ুন।

রায় সাহেব সামান্য একটু ল্যাংচানোভাবে চলিতে চলিতে বলিলেন, তবে তাই আন; হ্যাঁ, ব্যথাটা যেন একটু আউরেছে বটে।

ঘুড়ীটাকে বারান্দার পাশে আনিয়া দাঁড় করানো হইল। সে পিঠটা একটু সঙ্কুচিত করিয়া সংশয়ান্বিত দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিল।

৪

চড়িতে যা দেরি; ঘুড়ীটা সঙ্গে সঙ্গে তরতর করিয়া প্রাণ লইয়া পলানো-গোছের করিয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল; আমির হোসেনের হাতেই লাগামটা ছিল, অতি কষ্টে রুখিয়া ফেলিল। গালে পিঠে হাত বুলাইয়া আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; বলিল, টাণ্ডা রহ বেটী, ভয় নেই।

রায় সাহেব উঠিয়াই দুই হাতে কুইন অ্যানের ঘাড় জড়াইয়া শুইয়া

পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই প্রশ্ন করিলেন, ফোটো তোলা হচ্ছে না তো?

ফোটোগ্রাফার বলিল, তুলি নি এখনও; আপনি যেই একটু স্টেডি হয়ে বসবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে এক্স্‌পোজার দোব; সেইজন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

রায় সাহেব মাথাটা তুলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কুইন অ্যান হঠাৎ সামনের পা দুইটা মুড়িয়া পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিতে আবার মাথাটা গুঁজড়াইয়া পড়িলেন এবং ওরই মধ্যে নির্ভুল হিসাব করিয়া বলিলেন, আপনি তা হ'লে কাল আসবেন, খবর দোব। আমির হোসেন কাছে আছে তো?

এই যে রয়েছি হুজুর, লাগামটা দোব?

না না, ধ'রে থাক, লাগাম চাইছি না, জিজ্ঞাসা করছিলাম—ওই আবার উঠল; টেনে নামাও, টেনে নামাও আমির হোসেন; ব'সে পড় ভুঁয়ে, শিবু বেয়ারাকে ডেকে নাও, ভারী আছে।

আমির হোসেন টানিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেই কুইন অ্যান সামনের পায়ে ভর দিয়া পিছনে লাফাইয়া উঠিল।

রায় সাহেব ঘাড়ের দিকে খানিকটা পিছলাইয়া গিয়া আর্তস্বরে বলিলেন, তোমরা কেউ ল্যাজ চেপে ধর, কিছু বলবে না, খুব ঠাণ্ডা ঘো—

আমির হোসেন তাড়াতাড়ি সাবধান করিয়া দিল, না না, ল্যাজে হাত দিলে আজ ও বরদাস্ত করবে না, একে মন ভাল নেই, মোটে এই একটু ফুর্তি জ'মে আসছে—

রায় সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, তা হ'লে? এ যে একবার সামনে উঠছে, একবার পেছনে উঠছে, এ কোন্ দেশী ফুর্তি আমির হোসেন? বাপ রে, যেন কাপড়-কাচা করছে!

সাহেব পিঠে হাত ঠুকে বলতেন, 'ডার্লিং, প্রিটি ডিয়ার!' তাই বলুন না হুজুর!

পারিষদদের মধ্যে একজন বলিল, ডালিং তো মেমকে বলে সাহেবরা, সে কথা উনি ঘুড়ীকে কেমন ক'রে—

আওয়াজ পাইয়া রায় সাহেব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, তোমরা বুঝি সব তামাশা দেখছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? মেমসাহেবকে বলে—কেন, একে বললে কি অন্যায়টা হয়? ডালিং, ডার্লিং, ডার্লিং—তুমি সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে হাতটা ঘুরিয়ে ঠুকতে থাক আমির হোসেন, যেন মনে করে, আমি ঠুকছি, মানে সায়েব ঠুকছে। আর কি বলতেন সায়েব?

'প্রিটি ডিয়ার' বলুন হুজুর।

প্রিটি ডিয়ার—ওই রে! লাগাম ক'ষে ধ'রে থেকো। প্রিটি ডিয়ার! বলুন, নোটি গেরেল।

দেখো দেখো, অন্যমনস্ক হ'য়ো না। না, ওটা আর ব'লে কাজ নেই, বড্ড যেন বোঝে। গুড গার্ল বলতেন কি সায়েব? বললে বুঝতে পারবে? যাদুমণি সোনামণি এই রকম কতকগুলা বাংলা শেখাও এবার আমির হোসেন, যেমন শুনতে মিষ্টি, তেমনই—ধর ধর, ধর আমির হোসেন; আমি ভাবছি, নেমে আবার ভাল ক'রে উঠব; বেদখল ক'রে ফেলেছে, বারান্দার কাছে আর একবার নিয়ে যেতে পার?

যাচ্ছি হুজুর, তবে সায়েব বারান্দার ওপর পা তুলে রুটি খেতে শিখিয়েছিলেন, তাই ভাবছি—যদি হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়, আপনি এখন পিঠে রয়েছেন।

না না, তবে কাজ নেই; আর একটু দূরে সরিয়ে নাও বরং। বারান্দা থেকে কতটা দূরে আছে আমির হোসেন? দূরে গিয়েই বরং ভাল ক'রে দাঁড় করাও, নেমে পড়ি।

আমির হোসেন আর একটা সামনে উঠিবার ঝোঁক সামলাইতে সামলাইতে বলিল, নামতে গেলেই বাগড়া দেবে; মনটা ভাল আছে কিনা, একটু নাচতে কুঁদতে চায়; খালি জিন পছন্দ করবে না এখন। ভাল ওয়েলার হুজুর, এদের রেওয়াজই এই।

রায় সাহেব নিরাশভাবে বলিলেন, সর্বনাশ! তা হ'লে? নামতেও বাগড়া দেবে, পিঠে রেখেই বা কি ভাল ব্যবহারটা করছে? একি ফ্যাসাদে পড়া গেল!

কুইন অ্যান আরও দুই-এক বার সামনে এবং পিছনে পা তুলিয়া নিজের শরীরটা নানাভাবে দুলাইয়া দুলাইয়া যেন আমির হোসেনের কথাটার সমর্থন করিল, তাহার পর চিঁ-হিঁ-হিঁ করিয়া একটা সুদীর্ঘ হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল।

গলাটা বেশ ভাল করিয়া ধরিয়া রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন, ডাকলে কেন ওরকম ক'রে আমির হোসেন? বারান্দায় টেবিলের ওপর আমার প্লেটে পাঁউরুটি প'ড়ে আছে, শিগগির সরিয়ে নিতে বল তো।

না হুজুর, ডাকার পরে কুইন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ও ওর একটা লুটিস হচ্ছে।

রায় সাহেব তদবস্থ হইয়াই একটু পড়িয়া রহিলেন। পরে অতি সাবধানে মাথাটা সামান্য একটু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিক বলছ তো? দেখো।

হ্যাঁ হুজুর, প্রায়ই তো এই রকম—

তাড়াতাড়ি আবার শুইয়া পড়িয়া রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন, প্রায়ই মানে?

না, আর ভয় নেই হুজুর, বসুন সিধে হয়ে।

ভয় কথাটা বোধ হয় পৌরুষে বড় বেশি ঘা দিল; তাহা ছাড়া

ঘুড়ীটাও সত্যই আর নড়াচড়া করিতেছে না। রায় সাহেব সতর্কভাবে এবং আমির হোসেনকে খুব সতর্ক করিতে করিতে সিধা হইয়া বসিলেন। আমির হোসেন লাগামটা দিতে যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, আগে তুমি এক হাতে ওর ঘাড়ের চুলটা ধর ক'যে। আর দেখ, ঘাড়ের চুল বেশি ছোট ক'রে ছেঁটে কাজ নেই, বড় চুলেই ঘুড়ীকে মানায় ভাল।

পারিষদরা আবার আগাইয়া আসিয়াছিল। অনন্ত বলিল, আজ্ঞে, তা তো মানাবেই, ঘুড়ী হ'ল মেয়ে-ঘোড়া কিনা।

রায় সাহেব ঘুড়ীর কানের মাঝখানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া ছিলেন। মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; কে, অনন্ত ?

অনন্ত আরও আগাইয়া আসিয়া উত্তর করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

যেন ঠাণ্ডা হয়েছে, না ?

হতেই হবে হুজুর, কার পাল্লায়—

ফোটোগ্রাফার চ'লে গেছে ?

দূরে বারান্দার এক কোণ হইতে উত্তর আসিল, না, এই তো রয়েছি।

অনন্ত বলিল, যান না, এই বেলা টুপ ক'রে ফোটোটা তুলে নিন না মশাই। হুজুর তো বেটীকে শায়েস্তা ক'রে এনেইছেন।

ফোটোগ্রাফার আস্তে আস্তে নামিয়া প্রায় বিশ হাত দূরে স্ট্যাণ্ডটা দাঁড় করাইয়া ক্যামেরাটা বসাইল। নিজে কালো পর্দার ভিতর ছয়-সাত বার মাথা গলাইয়া, বাহির করিয়া প্রায় মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফোকাস ঠিক করিল। কুইন অ্যান স্থির, ল্যাজটি পর্যন্ত নড়ে না। ফোটোগ্রাফার চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, ঠিক হয়েছে, আর সেকেণ্ড কয়েক ; দেখবেন, যেন—

লেন্সের মুখ হইতে ক্যাপটা খুলিয়া লইয়া কায়দা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, ওয়ান, টু—

কুইন অ্যান এতক্ষণ পরে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়চোখে দেখিয়া লইল, এবং থ্রী বলার সঙ্গে সঙ্গে চিঁ-হিঁ-হিঁ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলকে ঘুরিয়া গিয়া ক্যামেরার একেবারে সামনা-সামনি হইয়া দাঁড়াইল।

ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা ছাড়িয়া 'বাপ রে বাপ' বলিয়া তিন লাফে গিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। যাহারা বারান্দায় ছিল, তাহারা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রায় সাহেব লাগাম ছাড়িয়া গলা আঁকড়াইয়া শুইয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমির হোসেন তাড়াতাড়ি আসিয়া লাগামটা ধরিয়া ফেলিল।

একটু রুক্ষভাবেই বলিল, ওয়ান টু— ওসব বলবার কি দরকার ছিল ওনার? ওই ব'লে সায়েব এদানি ওকে হার্ড্‌ল ডিঙুতে শেখাচ্ছিল, ওনার ওই তিন-ঠ্যাঙে জিনিসটা দেখে ভাবলে বুঝি—

রায় সাহেব শুইয়া শুইয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, সরিয়ে নাও ফোটোগ্রাফার, ওটা সরিয়ে নাও। হার্ড্‌ল রেস—সেই সাত বেড়া ডিঙিয়ে ছোটে তো? নিয়েছ সরিয়ে?

কুইন অ্যানের হার্ড্‌ল ডিঙাইবার ইচ্ছা ছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু সম্ভাবনার পূর্বেই তিন-চারজন আসিয়া স্ট্যাণ্ড ও ঢাকনাসুদ্ধ ক্যামেরাটা বারান্দায় তুলিয়া ফেলিল। কুইন অ্যান সামনের ডান ক্ষুরটা দিয়া কাঁকরের রাস্তাটা চার-পাঁচ বার জোরে জোরে আঁচড়াইল, তারপর খুব আস্তে আস্তে শরীর আন্দোলিত করিয়া সামনে চলিতে আরম্ভ করিল। রায় সাহেব ঘাড়ের রোমরাশির ভিতর হইতে রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করিলেন, কোথায় চলল বল তো আমির হোসেন? ক্যামেরাটা বারান্দায়, না ঘরে?

মন-মরা হয়ে যেন আস্তাবলে চলল ব'লে বোধ হচ্ছে। ওর ইচ্ছেটা ছিল একটু ঘুরে ফিরে আসা হুজুর, শেষ নাগাদ একটু ডিঙুবে ব'লে আশা করেছিল্, তাও হ'ল না। ওর দিল ভেঙে গেছে, দেখছেন না?

রায় সাহেব মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, হুঁ। যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া তিনি ঘুড়ীর ভাঙা দিল প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

একটু পরে প্রশ্ন করিলেন, যাচ্ছে তো ঠিক আস্তাবলের দিকে আমির হোসেন? কোন্‌খানটায় এল? কতক্ষণ থাকে বল তো মন-মরা ভাবটা? আর মিনিট পাঁচ-ছয় থাকবে না?

পরদিন সকালে রায় সাহেব একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। পারিষদেরা উপস্থিতই ছিল। অনন্তকে বলিলেন, তুমি ঠিক বলেছ অনন্ত, বাতটা একেবারে সেরে না গেলে ঘোড়ায় চড়াটা কাজের কথা নয়। দিব্যি পছন্দ হয়েছিল ঘুড়ীটা হে, যেমন দেখতে, তেমনই তেজী, কাল দেখলাম কিনা একটু নেড়ে-চেড়ে। ভেবেছিলাম, মনের মতনটি ক'রে গ'ড়ে নোব। কিন্তু না, তুমি দিয়ে দাও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন। সামনের শীতটা যাক, তখন আবার একটা কিনে নিতেই বা কতক্ষণ?

পারিষদদের মধ্যে একটি নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

তাপস

মনুজকুমারের পড়িবার ঘর। দ্বারের সামনা-সামনি ওদিকে মাঝারি সাইজের একটা টেবিলের প্রান্তে খোলা র‍্যাক একটা, বইয়ে ঠাসা—ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত এবং দর্শনশাস্ত্রের পাস ও অনার্স মিলাইয়া রাশীকৃত বই। এক পাশে একটি চৌকি, হাত দুয়েকও চওড়া হয় কি না হয়। উপরে একটা কালো রঙের কম্বল পাতা, মাথার দিকে একটি পাতলা বালিশের সঙ্গে একখানি চাদর গোটানো—মনুজের বিছানা। টেবিলের সামনে একটি চেয়ার—বাহুহীন, শীর্ণকায়; পিঠটা এত সোজা এবং উঁচু, যেন যে বসিবে তার মেরুদণ্ডটা সিধা রাখিবার জন্য উদ্দণ্ড হইয়া আছে।

কাকা বলেন, পড়াটা তপস্যা, মনুজের ওটা তপস্যাগার ক'রে দিলাম। মনুজ কাকা ভিন্ন আর সবার কাছে বলে, জেলখানা।

ঘরের সিলিঙে একটি বিজলী পাখার পয়েন্ট আছে, পাখা নাই। এক দিকে দেওয়ালে একটা আলোর ব্র্যাকেট, বাল্‌বটা না থাকায় পুষ্পহীন বৃন্তের মত একটা রুক্ষ রিক্ততা লইয়া ঘরটাকে যেন আরও কয়েকগুণ বিরস করিয়া রাখিয়াছে। এই দুইটি কাকা সম্প্রতি সরাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, পুরাণ কিংবা ইতিহাসে কাউকেও বিদ্যুতের আলো কিংবা পাখার নীচে তপস্যা করতে শুনেছ?

মুখ ফুটিয়া উত্তর দেওয়ার উপায় নাই, অথচ উত্তর খুবই সোজা বলিয়া হালকা আগুনের মত দাউদাউ করিয়া তাহার সমস্ত শরীরটাই যেন জ্বালাইয়া দেয়। ঝোঁকটা পড়ে কাকীমার উপর। হয়তো কুটনা কুটিতেছেন, মনুজ শুষ্কমুখে কাছে গিয়া বসিল; এটা ওটা নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমার কুটনোও কুটছ নাকি?

ওঃ, মস্তবড় খাইয়ে ছেলে আমার, ওঁর জন্যে আবার আলাদা ক'রে কুটনো! কেন?

আমার চাল নিও না আজ।

কেন শুনি? আজ আবার কি হ'ল?

কিচ্ছু না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কথাটা বাহির হইয়া পড়িবেই জানিয়া কাকীমা মনে মনে হাসিয়া নীরবে কুটনা কুটিতে লাগিলেন। মনুজ এক সময় চোখ মুখ অন্ধকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমার দ্বারা ওরকম তপস্যা হবে না এই ব'লে দিচ্ছি। ইস, তপস্যা!

কাকীমা হাসি চাপিবার জন্য একটা ছুতা করিয়া কাহাকেও কিছু ফরমাশ করিয়া কুটনা কুটিয়া চলিলেন। এদিকে উত্তরের অভাবে রাগটা আত্মনিরুদ্ধ হইয়া ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। মনুজ আর একটু থামিয়া বলিল, পুরাণ ইতিহাসের কথা যে বলছ, সে সব সময়ে কি ইলেক্‌ট্রিসিটি ছিল যে, লোকে পাখার হাওয়া খাবে, সুইচ টিপে আলো জেলে পড়বে? যত সব হাঘরে, একরত্তি ক'রে তেল জুটত না যে রাত্তিরে জেলে পড়বে, তারা আবার—! আর ফট ক'রে যে ব'লে বসলে পুরাণের কথা, আর আমি যদি উত্তর দিই যে, রাবণরাজার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা নিশ্চয় বিদ্যুতের পাখার হাওয়া খেত, বিদ্যুতের আলোয় পড়াশোনা করত, তখন কি বলবে, বল? আমাদের দেশে যে এক সময় এ সবই ছিল, সে কথা তো ক্রমেই বেরিয়ে পড়ছে। ঠাট্টা ক'রে যে ব'লে বসলে, গাছে বিদ্যুতের পাখা টাঙিতে তপস্যা করত না, ইতিহাসের সবচেয়ে আধুনিক থিওরিটা জান? পৃথিবীতে নতুন কিছুই হচ্ছে না, যুগ যুগ পরে সেই একই জিনিসের পুনরাবর্তন হচ্ছে মাত্র। এসব যদি বলি তো বলবে, ভাইপো আমার মুখের ওপর চোপরা করতে শিখেছে। আচ্ছা, সর্বদাই যে বল—

কাকীমা আর হাসি চাপিতে পারিলেন না; বলিলেন, হ্যাঁরে, গরগর ক'রে মাথামুণ্ডু কি সব ব'কে যাচ্ছিস? 'বল বল' যে করছিস, বলেছি কি আমিই, না যে বলেছে সে আমার পরামর্শ নিয়ে বলেছে?

মনুজ অপ্রতিভ হইয়া একটু থামিল, কিন্তু দারুণ গায়ের জ্বালা আবার তখনই তাহাকে সব ভুলাইয়া দিল। অন্যমনস্কভাবে একটা পটল হাতে কচলাইতে কচলাইতে বলিল, তোমাদের কি? ঈজি-চেয়ারে শুয়ে ফ্যান খুলে দিব্বি তামাক পোড়াচ্ছ; হুকুম দিলে, মেনো, তুই তপস্যা কর্‌গে!

আমি তামাক পোড়াচ্ছি! তোর হ'ল কি মনু?

তোমায় বললাম? বেশ, এইবার তুমি সুদ্ধু লাগ আমার পেছনে, আমার কিচ্ছু ব'লে দরকার নেই বাপু, আমায় যদি তপস্যাই করতে হয় তো বনে গিয়ে করব, পৌরাণিক যুগে তাই করত, ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধও তাই করেছিলেন; রেড়ির তেলের আলোও তা হ'লে যোগাতে হবে না, আর তোমাদের ওই দেড় বিঘতের চৌকি, ওটুকুরও দরকার হবে না। দাও আমার বনে যাবার ব্যবস্থা ক'রে।

আচ্ছা, তোর কাকাকে ব'লে দোব 'খন ব্যবস্থা করিয়ে। আপাতত কাল যে একবার বাড়ি যেতে হবে, সে খবর পেয়েছিস? বড়ঠাকুরের চিঠি দেখেছিস?

আমার দেখেও কাজ নেই, গিয়েও কাজ নেই, তপস্যা ভঙ্গ হবে।

হাতের পটলটা কুচি কুচি হইয়া গিয়াছে, একটা আলু তুলিয়া লইয়া কথার ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গে বুড়া আঙুলের নখটা তাহাতে বিঁধিয়া দিতে লাগিল। কাকী বলিলেন, জানি না বাপু, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে বুঝ্‌গে যা। আর কি যে ছাই তপস্যা, তাও তো বুঝি না। এই কি তপস্যার বয়েস? দিব্বি হেসে খেলে বেড়াবে, তা নয়; বুঝি না বাপু সব কাণ্ড।

মনুজ একচোট জলিয়া উঠিয়া বলিল, বুঝবে কোথা থেকে, পরের কষ্টের কথা কি একবার ভেবে দেখ তোমরা? আচ্ছা, ওদের আরতির যে ঘরের নীচে ম্যাটিং করা, দুটো ভাল সোফা, বসবার চেয়ারে মখমলের গদি আঁটা, হারমোনিয়াম, ব্যাঞ্জো, ফ্যান, চমৎকার শেড দেওয়া আলো, পড়বার জন্যে একটা টেবিল-ল্যাম্প, দুটো ভাস—যখনই দেখ—টাটকা ফুলে ভরা, বল, তপস্যা ভঙ্গ হচ্ছে! এবারে টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে, ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ বাঁধা। আর মেনো, তুই তপস্যা ক'রে মর্—

কাকীমা একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন, দিব্বি মেয়েটি; সত্যি, ইচ্ছে হয় ঘরে নিয়ে আসি।

মনুজের একটু হুঁশ হইল যেন; আলোচনাটিতে যে একটু লজ্জার কারণ আছে, অতটা খেয়াল তাহার হয় নাই। কিন্তু রাগটা তবু লাগিয়া আছে, জিহ্বা বশে আসিতেছে না; কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, আমিও দেখিয়ে দোব, কি রকম তপস্যা করতে হয়, হ্যাঁ, দেখিয়ে দোব। চুলোয় যাক বই, হাত-পা গুটিয়ে চোখ বুজে বাল্মীকি ঋষি হয়ে—আচ্ছা, তপস্যাই যে বলছ, তা মিনিটে মিনিটে পিদ্দিমের সলতে ওসকাব, না তপস্যা করব, বল তো? বল না, তার বেলা কথা কইছ না যে?

কাকীমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, ওই যাকে জিজ্ঞেস করবার জিজ্ঞেস কর্ বাপু। সত্যিই তো বাপু,—

পিছন ফিরিয়া ছিল, কাকা আসিলেন সেটা দেখিতে পায় নাই। ঘুরিয়া দেখিয়াই হাতের চটকানো আলুটা ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল, ফ্যানের অভাবে কোন রকম কষ্ট কি অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মনুজ কাকীমার পানে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আজ্ঞে না।

দেখলে তো? ওতে আরও মন বসে বরং, নয় কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাকীমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া বলিল, তুমি পিদ্দিমটা ঠিক ক'রে রেখো তো কাকীমা, বড্ড নোংরা হয়ে গেছে।

কাকীমা ঠোঁটের কোণে একটু হাসি মিলাইয়া লইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, রেখেছি। হ্যাগো, ও যে বলছে কাল যাবে না বাড়ি, অথচ—

মনুজ একটু রাগিয়া বলিল, তাই বললাম? বলছিলাম, গেলেই পড়ার ক্ষতি তো, তাই—

কাকা মনুজের কাকীমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, দেখ, ঝোঁকটি কেমন আপনিই হয়ে আসছে। পড়াটা তো কিছু নয়—একটা সাধনা, তপস্যা; অবস্থাটা তপস্যার অনুকূল ক'রে দাও, দেখবে, আপনিই মন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে।

যাইতে যাইতে বলিলেন, তা যাক, হয়ে আসুক একবার বাড়ি থেকে, কি আর হবে তাতে!

মনুজ দুই-একবার আড়চোখে কাকার দিকে ফিরিয়া চাহিল; চলিয়া গেলে রাগে ঘাড় বাঁকাইয়া মুঠার উপর মুঠা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, আমি কখনও যাব না, দেখি আমায় কে যাওয়ায়! তুমি যেন তা ব'লে ব'লে দিতে যেও না; হ্যাঁ, আর যদি যেতেই হয় তো আমি গরুর গাড়িতে যাব আগেকার তপস্বীদের মতন, দেখি আমায় কে মোটরে ক'রে পাঠাতে পারে! আর আমার যদি আজ চাল নাও তো—

কাকীমার ক্রুদ্ধ চক্ষু দেখিয়া আর শেষ না করিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অনুজের বি. এ.তে দর্শনশাস্ত্র লইবার কথা ছিল না। তাহার ঝোঁকটা ছিল ইতিহাসের দিকে। আই. এ. পরীক্ষায় ইউনিভারসিটি হইতে 'এইচ' অক্ষরও পাইয়াছিল। ইতিহাসেই অনার্স লইবে ঠিকঠাক, এমন সময় কাকার হাতে তাহার লেখা একটি প্রবন্ধ পড়িয়া গেল— "Feminine Beauty in the Making of History" (ইতিহাস-সৃষ্টিতে নারী-সৌন্দর্যের স্থান)। সংগ্রহের মধ্যে, তাহার বয়স ও শিক্ষার অনুপাতে, মৌলিকতাই ছিল; কিন্তু কাকা ভ্রাতুষ্পুত্রের মনের গতি লক্ষ্য করিয়া ভড়কাইয়া গেলেন। সাব্যস্ত হইল, তাহাকে দর্শন লইতে হইবে, অনার্সও দর্শনশাস্ত্রেই। মনুজ আড়ালে একটু গুঁইগাঁই করিল, কানে উঠিলে কাকা সামনা-সামনিই স্পষ্টস্বরে বলিলেন, কেন? যারা আসলে ইতিহাস গ'ড়ে তুললে—চন্দ্রগুপ্ত, বাবর, শেরশা, ক্রম্‌ওয়েল, এদের কথাই নেই, খোঁজ পড়ল গিয়ে কুইন মেরীর, নূরজাহানের! এর অর্থটা কি শুনি? ফেমিনিন বিউটি!

দর্শনশাস্ত্রটা বাড়িতে নিজেই পড়ানো আরম্ভ করিয়াছেন। দুইটি কারণ আছে; প্রথমত, জিনিসটি তাঁহার প্রিয়; দ্বিতীয়ত, ও শাস্ত্রে আবার মন যদি মিল হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির জড়বাদের দিকে চলে, তাহা হইলে বিপদ সমূহ; এমন কি ইতিহাসের চেয়েও ঢের বেশি, কারণ তাহার পরিণাম এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম, অর্থাৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। সুতরাং সেটিকে আবার আদর্শবাদের খাতে বহাইয়া লইয়া যাওয়া দরকার।

বন্ধুদের বলেন, সঙ্গে সঙ্গে এথিক্সের কড়া ডিসিন্‌ফেক্‌ট্যাণ্টও দিয়ে যাচ্ছি; দেখাই যাক না।

তাঁহার বিশ্বাস, ফল হইতেছে। তিনি যখন স্পেন্সার প্রভৃতির মতবাদগুলি সুতীক্ষ্ণ তর্কে এবং সুতীব্র মন্তব্যে ছিন্নভিন্ন করিতেন এবং কাণ্ট হেগেলের আদর্শবাদ লইয়া বেদান্তের কোঠায় গিয়া পড়িতেন, সে সময় ভাইপোর গভীর তদ্গত ভাব দেখিয়া নিজের ব্যবস্থায় বেশ আস্থাবান হইয়া উঠিতেছিলেন। মনুজ প্রথমে একটু আধটু তর্ক করিত, ক্রমে তন্ময়তার চোটে সেটাও বন্ধ হইয়া গেল, নীরবে তাঁহার যুক্তি-স্রোতবর্ষী মুখের দিকে চাহিয়া থাকে মাত্র। ক্রমে দেখা গেল, শুধু ধীরে ধীরে মাথা দোলাইতেছে ; এবং ইহার পরে একদিন দেখা গেল, কাকার উগ্র আলোচনার ঝোঁকে ঝোঁকে চৌকির উপর ছোট্ট করিয়া এক-একটা ঘুষি পর্যন্ত বসাইয়া দিতে লাগিল। কাকা মনে মনে হাসিলেন, ভাইপো একেবারে মাতিয়া গিয়াছে ; সুলক্ষণ।

সেদিন পড়ানো শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেই কিন্তু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। কানে গেল, ছোট্ট পার্কটির ওধারে একটি দোতলা বাড়ি হইতে দ্রুত তালে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে, পড়ানোয় অতিরিক্ত মনোনিবেশের জন্য এতক্ষণ শুনিতে পান নাই। কাকা কপালে বাঁ হাতের আঙুলের চারিটা ডগা চাপিয়া হেঁটমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন ; দুই-এক বার ঊর্ধ্বে নিম্নে মাথা দোলাইলেন, দুই-এক বার ডাইনে বাঁয়ে, যেন কি একটা আকস্মিক সমস্যার ঠিকমত মীমাংসা হইতেছে না। শেষে নিজের মনেই বলিলেন, নাঃ, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করাই ভাল। আবার ঘরের দিকে ফিরিলেন।

ঘরে পা দিতে আরও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। মনুজ সাইকলজির ভারী বাঁধানো বইটা বুকের কাছে চাপিয়া তড়বড় করিয়া বাঁয়া-তবলা বাজাইয়া যাইতেছে ; মিঠা ভঙ্গিমায় মাথাটি

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলিয়া যাইতেছে, চক্ষু গভীর তন্ময়তায় মুদ্রিত, গান তখনও ওদিকে চলিতেছে।

কাকা নির্বাক বিস্ময়ে একটু তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর উৎসাহভঙ্গস্বরে ডাক দিলেন, মনুজ!

মনুজ যেন আচমকা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। বাঁয়া-তবলাখানা আলগা হাত হইতে খসিয়া বিশৃঙ্খলভাবে নীচে গড়াইয়া পড়িল; বাদক কোন উত্তর না দিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। কাকা বলিলেন, এখন তো বাঁয়া-তবলাই বাজাচ্ছিলে স্পষ্ট দেখলাম, একটু আগের সম্বন্ধে আমার একটু খটকা রয়েছে, ঠিক বলবে তো?

মনুজ চক্ষু নামাইল।

আমি যখন ভাবছিলাম, আমার সঙ্গে তুমি বেদান্তের বিচারে বিভোর হয়ে মাথা দোলাচ্ছ, আর মেটিরিয়ালিস্ট্‌দের ওপর চ'টে চৌকিতে মাঝে মাঝে ঘা দিচ্ছ, তখন তুমি আসলে কোন একটা গানে তাল দিচ্ছিলে কি না বল তো বাপু? আরে ছ্যাঃ, এই তোমার তপস্যা! আমি কানের কাছে অমন একটা ইণ্টারেষ্টিং জিনিস নিয়ে ব'কে ব'কে বেদম হচ্ছি, গ্রাহ্যই নেই; আর পার্কের একটেরেয় কে গানকে ভেংচি কাটছে, তাই শুনে শুনে তুমি—ছি ছি!

ফিরিয়া যাইতে যাইতে মনে হইল, সব সন্দেহ মিটাইয়া লওয়াই ভাল। আবার ঘুরিলেন। ওভাবে কথা বাহির করা যাইবে না, সুর কিঞ্চিৎ বদলাইয়া বলিলেন, অবশ্য তোমার অতটা অন্যমনস্ক হওয়া ভাল হয় নি; কিন্তু ছেলেটি গাইছে বেশ, তোমায় ততটা দোষও দেওয়া যায় না। তবে কথা হচ্ছে, যতটা পারা যায় মনকে টেনে রাখাই ভাল। চেন নাকি ছেলেটিকে? এই পাড়াতেই থাকে?

কাকার এমন দরদ-মাখানো কথায় মনুজের মনের কপাট যেন হঠাৎ

খুলিয়া গেল। একটু সলজ্জ অথচ উৎসাহদীপ্ত মুখে বলিল, ছেলে নয় তো কাকা, আমাদের প্রফেসার কার্তিকবাবুর মেয়ে আরতি সান্যাল, এবার মিউজিক-কম্পিটিশনে সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়েছেন। ওঁর বাবা নিজেও একজন মস্তবড় গুণী লোক।

কাকা মনে মনে বলিলেন, বটে, বটে! অথচ ছেলেটা এদিকে 'হাঁ'-'না'র বেশি জবাব দেয় না কখনও। এ একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল যে! মনুজকে বলিলেন, হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম, ছেলের গলা এত মিষ্টি হয় কোথেকে! তা কদ্দিন ওঁরা এসেছেন এ পাড়ায়? ছিলেন না তো!

ঠিক একুশ দিন হ'ল আজ নিয়ে, ফার্স্ট জুলাই উঠে এসেছেন কিনা।

কাকার মনে হইল, প্রায় ওই আন্দাজ সময় হইতেই ভ্রাতুষ্পুত্রও পাঠের সময় মাথা দুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে গানের তালে। বলিলেন, বেশ, তেমন আলাপ-পরিচয় থাকলে ওঁদের সঙ্গে, একদিন নেমন্তন্ন ক'রে এলে হ'ত মেয়েটিকে। দেখছি, বেশ শোনবার মত গান।

মনুজ একেবারে বর্তাইয়া গেল। বলিল, খুব জানাশোনা আছে; প্রফেসার সান্যাল আমায় খুব স্নেহ করেন কিনা। তা ছাড়া ওঁর ছেলে, আরতি দেবীর ভাই কিরণ সান্যাল, আমার সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়ে, আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। আর মিস সান্যাল যে শুধু গানই গাইতে পারেন তা নয়, ব্যাঞ্জোতেও এমন চমৎকার হাত—

কাকা মনে মনে একটি 'হুঁ' বলিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, ছোট মেয়ে, যদি একলা না আসতে চায় তো তোমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড কিরণকেও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে এলে হয়।

মনুজ বোধ হয় আহ্লাদের চোটে স্থানকালপাত্র ভুলিয়া গেল। বলিল, না, আরতি সান্যাল তত ছেলেমানুষ নয় তো; বয়েস পনরো-ষো— মানে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন। তা কিরণকে বললে আরও ভালই হয়। বলেন তো পরশুই না হয় ব'লে আসি—রবিবার আছে।

সব বুঝা গেল, বয়সটি পর্যন্ত। কাকা যাইতে যাইতে বলিলেন, দাঁড়াও দেখি, পরশু আমায় বোধ হয় হুগলী যেতে হবে। তুমি কিন্তু বাপু, পড়াশুনোর দিকেও একটু মন রেখে যেও, বইগুলোকে তবলা ক'রে ক'রে উচ্ছন্ন দিলে আর কি হবে?

৩

অপর কেহ হইলে তপস্যার নমুনা দেখিয়াই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিত; কিন্তু মনুজের কাকা অন্য ধাতের মানুষ।

রবিবার দিন নিমন্ত্রণের কথা না তুলিয়া বলিলেন, তোমার দেখছি রাত্তিরটায় গানবাজনার অত্যাচারে খুবই ব্যাঘাত হয়। পাড়াটাও হয়ে উঠছে বড্ড খারাপ; দেখছি কিনা, সকালবেলা সতরো নম্বর বাড়িতে কর্তার সা-রে-গা-মা দশটা পর্যন্ত, সে যেই আঙুল ঘুরিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আপিসে বেরুল, ছেলেটা কর্নেট বের করলে। বিকেল-বেলা তো সমস্ত পাড়াটা গন্ধর্বপুরী হয়ে দাঁড়ায়। রাত্রে একটু ক্ষান্ত দে সব! আবার এই এক নতুন অত্যাচার জুটেছেন, লোকের তাল দিয়েই ফুরসৎ নেই তো পড়বে কখন?

মনুজ কাপড়ের পাড়ের রংটা ঘষিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাকা মন্তব্যটি মনে ভাল করিয়া বসিবার অবসর দিয়া বলিলেন, বেশ ব্যাঘাত হচ্ছে। আমি তাই ঠিক করেছি, তুমি সুমুখ-রাত্তিরে পড়া বন্ধ ক'রে মাঝরাত্রে উঠে তোমার সাধনা কর, থাক্ ওরা গানবাজনা নিয়ে। তুমি এগারোটার সময় না শুয়ে সাড়ে আটটার সময়ই শুয়ে পড়, কেমন?

মনুজ মাথা কাত করিয়া সম্মতি দিল।

কাকা বলিলেন, বাকি থাকে ঘুম ভাঙার কথা। একটা অ্যালার্ম-ঘড়ি

কিনে আনছি। সে ধরনের অ্যালার্ম নয় যে, একেবারে আচমকা ঝনঝন ক'রে উঠে হুড়মুড়িয়ে তুলে দেবে; তাতে ব্রেনে ভয়ানক শক লাগে। আমি যার কথা বলছি, এ বেশ একটা নতুন ধরনের জিনিস, বেরিয়েছে জার্মেনি থেকে, আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়ে মিষ্টি খানিকটা গতের মত বেজে প্রথমে ঘুমের ঘোরটা ভেঙে দেবে, তারপরে জোরে খানিকটা জলদ, সেটা মিনিট-কয়েক পর্যন্ত চলবে; মানে, ঘড়ি নয়, পেয়াদা, ঘুম না ভাঙিয়ে ছাড়বে না, তবে ওই রকম গায়ে হাত বুলিয়ে। বললে, দু-তিন দিনের মধ্যে জার্মেনি থেকে কন্‌সাইন্‌মেণ্ট এসে পড়বে। ততদিন চালাও কোন রকমে, তবে ওরকম ক'রে তাল দিও না বাপু; বাঁয়া-তবলাই বা তুমি শিখলে কোত্থেকে? কই, আমি তো ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতাম না!

ফিরিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মুঠায় দাড়ি চাপিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিজের মনেই বলিলেন, নিষুতি রাত, আর মেয়েটার নামই কত রকম ভাবে আওড়ালে সেদিন—আরতি, আরতি দেবী, আরতি সান্ন্যাল, মিস সান্ন্যাল!

ভিতরে গিয়া বলিলেন, পদ্য-টদ্য লেখার বাই নেই তো? দেখো বাপু, নির্জন রাতের ও আবার একটা বিপদ আছে।

কুটনা কোটা হইতেছিল, মনুজ গিয়া বসিল। মুখ অন্ধকার, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছে। কাকীমার ঠোঁটের কোণটা একবার যেন একটু কুঞ্চিত হইল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না। খানিকক্ষণ গেল।

মনুজ একবার আড়চোখে চাহিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমারও তরকারি কুটছ নাকি?

হ্যাঁ, অদ্ধেকগুলো তোর, আর বাকি অদ্ধেক আমাদের সব্বার।

এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। মনুজ একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ঠাট্টা! কিন্তু দেখো, আমি যদি আজ কিছু খাই তো—

কাকীমা হঠাৎ কড়া চোখে চাহিয়া উঠিতে বলিল, বেশ, দিব্যি না করতে দাও তো ব'য়ে গেল; কিন্তু কে খাওয়াতে পারে আমায় একবার দেখব! রাত জেগে তপস্যা কর! বেশ, নিদ্রা যদি ছাড়তে হয় তো আহার নিদ্রা আমি দুইই ছাড়ব, ঘর ভেঙে ফেললেও দোর খুলব না, দেখি। মস্ত দোষ করেছে সবাই গান গেয়ে, অত গানে ভয় তো চল না সবাই ফ্যারাওদের পিরামিডের ওপর গিয়ে ব'সে থাকি। আর অমনই খপ ক'রে যে ব'লে বসলে, তাল দিচ্ছিলাম, মিছে অপবাদ, কানের কাছে ওরকম কচকচ করলে কখনও অমন দ্রুত ঠুংরির তালে— মানে, ইয়ে— আচ্ছা বেশ, তুমি যে বললে অ্যালার্ম-ঘড়ি কিনে আনবে, আমি যদি সেদিনকার কথা তুলে বলি যে, সেসব যুগে যেমন ইলেকৃট্রিক লাইট আর ফ্যানের নীচে ব'সে তপস্যা করত না, তেমনই যোগনিদ্রা ভাঙবার জন্যে অ্যালার্ম-ঘড়িরও বালাই ছিল না, তখন? তা হ'লেই তো হবে, মেনো হয়ে উঠেছে এক নম্বর বাচাল, তার্কিক! বেশ, আমি কোন তর্ক করব না, কিন্তু দেখো, এই শপথ—শপথ না ক'রে বলছি—

কাকীমা চটিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু শপথ না করায় ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, আবার রাত জাগা, অ্যালার্ম-ঘড়ি, এসবের হাঙ্গাম কেন বাপু? একে তো দুধের দাঁত না ভাঙতে ভাঙতে চোখে চশমা, প'ড়ে প'ড়ে চোখের ওপর অত্যাচার ক'রেই তো?

মনুজ আবার একবার জ্বলিয়া উঠিল, এবার সহানুভূতির বাতাসে। বলিল, নাঃ, আমার আর ওসবের দরকার কি? চোখ যাক, কানও যাক, কাউকে—মানে, কিচ্ছু চোখে না দেখি, কারুর গান—মানে, মানে— তা হ'লে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় কিনা; চোখ-কান বুজে বাল্মীকি

ঋষি হয়ে তপস্যা করি খালি। বেশ, এইবার আমি করবও তাই, এমন শক্ত ক'রে কানে তুলো গুঁজে ব'সে থাকব যে, কানের কাছে কামান দাগলেও— অ্যালার্ম-ঘড়ি কিন্তু তোমার আমি আগে শেষ করব, যতবার সারিয়ে নিয়ে আসবে—

কাকীমা আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণের বদ্ধ হাসির মুক্তিতে দুলিতে দুলিতে বলিলেন, হ্যাঁরে, সব তো আমার ঘাড়েই চাপাচ্ছিস, যেন আমিই যত অপরাধ করেছি। যাক, কিন্তু কামান দাগলেও যখন শুনতে পাবি না, তখন মিছিমিছি ঘড়িটা ভাঙবি কেন, শুনি ?

মনুজ আর একচোট রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরের ঘর হইতে কাকাকে এমুখো আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল, এবং মুখের চেহারাটা শোধরাইয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কাকা আসিয়া বলিলেন, এই যে, তোমার কাকীমাকে বুঝি সেই অ্যালার্ম-ঘড়িটার কথা বলছিলে ?

মনুজ চেহারাটাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া আনিয়াছে ; কেন না এ অনুশীলন তাহাকে প্রায়ই করিতে হয় আজকাল। উত্তর করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাকীমা বলিতে যাইতেছিলেন, হ্যাঁগা, আবার নাকি রাত জেগে—

মনুজ তাড়াতাড়ি মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, বাঃ রে ! রাত না জাগলে ওই অতগুলো অনার্সের বই সামলাবে কে ?

কাকা বলিলেন, কেন, ওঁর বুঝি অমত তোমার রাত জাগায় ? তোমরা মেয়েমানুষেরা বোঝ না সোঝ না, অথচ সব কথাই—

মনুজ কাকীমার চাপা হাসিতে রাঙা মুখখানার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, ওঁর অমত হ'লেও আমি শুনব কেন সে কথা, হুঁ !

কাকা চলিয়া গেলে সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, ঘড়ি যদি আমি মুচড়ে না সাবাড় করি তো আমার নামে— বাঃ রে! কুকুর পুষো ব'লেও দিব্যি করতে পারবে না লোকে, অমনই শাসিয়ে উঠলে? আচ্ছা, দেখো তখন, আসুকই না ঘড়ি।

হনহন করিয়া সে চলিয়া গেল।

৪

ঘড়িটা দোকানে আসিয়াছে, কাকা কিনিয়া আনিতে গিয়াছেন। মনুজ পার্কের ওধার হইতে একটু বেড়াইয়া আসিতে গিয়াছিল, কোন্ দিক দিয়া যে দেরি হইয়া গেল, সেটা হুঁশ ছিল না। বাড়ি ঢুকিতে যাইবে, কাকার সামনা-সামনি পড়িয়া গেল। প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল বাপু, এই রোদ্দুর মাথায় ক'রে?

কাকার কাছে এথিক্স অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র পড়িতে পড়িতে এমন অবস্থা হইয়া আসিতেছে যে, প্রয়োজনমত সোজাসুজি মিথ্যা কথাটা আর মুখ দিয়া বাহির হয় না, অথচ খাঁটি সত্য বলিবার শক্তিটাও তেমন আয়ত্ত হয় নাই। মনুজ সত্য মিথ্যা মিশাইয়া বলিয়া ফেলিল, প্রফেসার সান্যালের বাড়ি; কিরণের সঙ্গে ব'সে ব'সে এথিক্সের একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

বেশ ভাল কথা। কতক্ষণ?

মনুজ একটু উৎসাহের সহিতই বলিল, আজ্ঞে ঘণ্টা-দেড়েক হ'ল গিছলাম; আন্দাজে বলছি, কিছু বেশিও হতে পারে।

কাকা বলিলেন, আজ হঠাৎ ঘণ্টা-দেড়েক আগে তোমাদের প্রফেসার সান্যালের সঙ্গে আলাপ হ'ল; যে দোকানে ঘড়ি কিনছিলাম, সেই দোকানেই তিনি তাঁর ছেলে কিরণের জন্যে একটা রিস্ট-ওয়াচ

দেখছিলেন। কিরণই সান্যাল মশাইকে বললে, আমি তোমার কাকা, আলাপ করতে করতে একসঙ্গেই এলাম তিনজনে।

স্থির শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টিতে ভাইপোর পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন, ওই কিরণের কথাই বলছ তো?

মনুজ মৃৎপুত্তলীবৎ নির্বাক নিশ্চল থাকিয়া প্রয়োজনীয় উত্তর দিল।

কাকা পকেট-ঘড়িটা বাহির করিয়া করতলে রাখিলেন; ডায়ালটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, চারটে বিয়াল্লিশ। আরতি—আরতি দেবী নিশ্চয়ই এই খানিকক্ষণ আগে স্কুল থেকে এসে ব্যাঞ্জো নিয়ে বসেছেন, তাই হাঁ ক'রে গেলা হচ্ছিল তো?

এ রকম কোণঠাসা হইয়া মনুজ স্বীকার করিয়াই ফেলিত। কিন্তু নেহাত একেবারে 'হাঁ করিয়া গেলা', তাই কোন উত্তর না দিয়া সে পূর্ববৎই নিশ্চল হইয়া রহিল। কাকা হ্যাভ্‌লক এলিস পড়েন, সব জিনিসে স্পষ্টতার বিশেষ পক্ষপাতী; স্বচ্ছন্দে আরও বে-আবরুভাবে প্রশ্নাদি করিতে পারিতেন, কিন্তু আপাতত আর কিছু না বলিয়া ছোট্ট করিয়া শুধু 'হোপ্‌লেস' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে মনুজ নূতন বন্দোবস্তমত আটটার সময় আহার করিয়া লইল। ঠিক সাড়ে আটটায় কম্বলের উপর চাদরটা টানিয়া শয্যা রচনা করিতেছে, কাকা আসিয়া টেবিল হইতে নূতন ঘড়িটা তুলিয়া লইলেন। অ্যালার্মের দম দিয়া, কাঁটাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, এই একটা ক'রে রাখলাম। যদি বন্ধ ক'রে না দাও তো ঠিক দশ মিনিট বাজবে। ছোট বিছানাটিতে শুয়ে শুয়ে ক্রমেই বেশ সংযমের একটা ভাব আসছে না কি? এদিকে আধ হাত গেলেও পড়ব, ওদিকে আধ হাত গেলেও পড়ব, মনের অবচেতন অবস্থার মধ্যে এই ধারণাটি মনকে চারিদিক থেকে বেশ নিয়ম আর সংযমের বশীভূত ক'রে আনবে; তপস্যা এই

সবকেই বলে। আচ্ছা, এখন শুয়ে পড়। এর অ্যালার্মের দমটা বাঁ-দিকে দিতে হয়, অ্যারো-হেড দিয়ে দেখানোই আছে।

কাকা চলিয়া গেলে মনুজ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া চৌকির উপর একটা ঘুষি কষাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, কাল যদি আমি নির্ঘাত ডান দিকে চাবি না দিই তো আমার অতিবড় কোটি দিব্যি রইল।

মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা মুচড়াইয়া বলিল, ক'ষে দোব।

তাহার পর কাল কুটনা কুটিবার সময় কাকীমাকে কি সব স্পষ্ট কথা শুনাইবে, মনে মনে তাহারই মহলা দিতে দিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল। মেঘলা রাত, কিন্তু তন্দ্রার সঙ্গে বর্ষার যে একটু সুমিষ্ট প্রত্যাশা জমিয়া উঠিতেছিল, ঠিক ঘুমের মুখে মুখে আপদ ঘড়িটার কথা মনে উঠিয়া সেটুকুকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে লাগিল।

মাঝরাত্রে উঠিয়াছে; কিন্তু চোখ যেন চাড়া দিয়াও খোলা যায় না, অভ্যাস তো নাই। প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, আলো জ্বালিতে হইবে, কিন্তু চোখের পাতার উপর কে যেন দুইটি আধমুণে পাথর চাপাইয়া দিয়াছে। কাকার উপর চটিয়া দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, হুঁঃ, তপস্যা! তপস্যা! কথাটা যেন চিবাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিতে পারিলে আক্রোশ মিটে।

এমন সময় দোরে খটখট করিয়া দ্রুত করাঘাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত তাগিদ, শিগগির দোর খোল।

কে, কাকা?

উত্তর হইল শুধু খিলখিল করিয়া হাসি, যেন একটা সঙ্কীর্ণ অথচ বেগচপল জলস্রোত কুলকুল করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এ যে চেনা হাসি! মনুজের বুকটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল; আধভাঙা গলায় প্রশ্ন করিল, আরতি?

আগে দোর খোল, বৃষ্টিতে মলাম ভিজে।

সংযমের চৌকি হইতে এক রকম অধঃপতিত হইয়াই মনুজ টলিতে টলিতে গিয়া কপাট খুলিয়া দিল। খানিকটা প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া ও বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে আরতি প্রায় ঘাড়ে পড়-পড় হইয়া ঘরটার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল ; ভিজিয়া চুপসিয়া গিয়াছে একেবারে। প্রশ্ন করিল, আলো কোথায় ?

মনুজ আরতির প্রশ্নে অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া, দরজার কাছে নীরবে সেই অন্ধকারটিতে মাথা নীচু করিল। তাহার পর পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া অনেক রকমে প্রদীপটা জ্বালিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা। এই কঠোর তপগৃহের কুণ্ঠিত আলোক এ অকিঞ্চন অভ্যর্থনায় যোগ দিতে যেন নিতান্তই অনিচ্ছুক।

আবার ঘরের সিক্ত অন্ধকারের মধ্যে সেই তরল হাসি যেন ছলছলিয়া উঠিল। আরতি নিজের আর্দ্র বস্ত্রের মধ্য হইতে একটা বিদ্যুতের বাল্‌ব বাহির করিল, উঠিয়া ব্র্যাকেটটাতে লাগাইতে লাগাইতে বলিল, আমি জানি যে তোমার দুর্দশার ইতিহাস, কিরণদার কাছে শুনলাম কিনা, তাই তোয়ের হয়েই এসেছি। আলো জাললেই তপস্যার সব সরঞ্জাম অনধিকারীর চোখে ধরা প'ড়ে যাবে, আর বিঘ্নেরও আশঙ্কা !

আবার হাসি। হাসি না তো, জলের স্রোত যেন আশেপাশে সমস্ত জায়গাটা ছাইয়া ফেলিয়াছে—কুলকুল কুলকুল।

আরতি নামিয়া নিজেই সুইচটা টিপিয়া দিল। অনেক দিনের নির্বাসিত আলো যেন আচমকা ফিরিয়া আসিয়াছে, ঘরটি ভরিয়া গেল।

সামনেই আরতি দাঁড়াইয়া। দুষ্টামির হাসিতে ভরা ঠোঁটের একটা কোণ মুঠা দিয়া চাপা। চুল, ভ্রূ, পক্ষ্ম আর সিক্ত বসন হইতে শীকরের মুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছে।

এদিকে এত আলো, তবু কিন্তু ঘরটাতে কেমন একটা জড়তা, একটা অস্পষ্টতা। মনুজ ভাবিল, এ কি তাহার চোখের লজ্জার জন্য নাকি? অসম্ভব নয়, আরতি আল্ট্রা-মডার্ন হইয়া তাহাকে যেন অনেক পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে, তাল রাখিয়া উঠা যায় না। লজ্জা ঠেলিয়া নেহাত কিছু একটা বলিবার জন্যই বলিল, আলোটা বেশ খুলছে না যে, বাদলে জ'লো হাওয়ার জন্যেই নাকি, বল তো?

চপল হাসিতে আরতির বৃষ্টিতে ভেজা মুখখানি ঝিকমিক করিয়া উঠিল। প্রগল্‌ভার মত বলিল, শোন কথা! আরতির সামনে কখনও আলো খোলে নাকি?

চোখের কোণে কোথায় যেন নিজের অতি-বেহায়াপনা, একটু লজ্জা, মুক্তির পাশে পাশে সঙ্কোচ, আর সেই হাসির কুলকুল শব্দ, বর্ষার সঙ্গে ওর গলায় যেন ধারা নামিয়াছে।

আরতির আবির্ভাবটা মনুজের যেন অদ্ভুতভাবে কি এক রকম মনে হইতেছিল, অত্যন্ত মিষ্ট, প্রায় অসম্ভবের কোঠায়; অতিশয় আশ্চর্য, প্রায় অলৌকিক; তাহারই মধ্যে আবার নিতান্তই অন্তরঙ্গ একটা ঘটনা, তাহার জীবন-সম্পর্কে সবচেয়ে সহজ সত্য, এতই সহজ যে অপার্থিব হইয়া অনায়াসেই সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; এমন একটি সত্যের আলোকে স্পষ্ট যে, তাহার সামনে কাকা, তপস্যা, অ্যালার্ম-ঘড়ি—এসবই যেন কুয়াশার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর কি রকম একটা অনুভূতি, বাস্তবেও যেন স্বপ্ন, স্বপ্নেও যেন বাস্তব। এত পলকা একটা কিছু যে, সাহস করিয়া একটা প্রশ্ন করিয়াও উঠিতে পারিতেছে না। মনে হইতেছে, আসার কারণ সম্বন্ধে কোন জবাবদিহি করিতে গেলেই সমস্ত ব্যাপারটা কোন্ দিক দিয়া যেন মিলাইয়া যাইবে।

মনুজ একটু লজ্জিত হাসি হাসিয়া বলিল, ব'স আরু।

বর্ষার জলের মতই আরতি যেন হাসির স্রোত বহাইবার পথ খুঁজিতেছে। হাসিয়া হাসিয়া বলিল, কোথায় ? ওই একফালি চৌকিতে ? মাফ কর, আমার অত তপস্যার জোর নেই, প'ড়ে মরব, অত সূক্ষ্ম জিনিস সহ্য হবে না। বরং তুমি ব'স ওটাতে, কিংবা শুয়ে পড়। আমি চেয়ারটাতে ব'সে, যা করতে এসেছি, তাই করি।

ব্যাঞ্জোটা বাহির করিয়া কোলে রাখিল। মনুজ অতিমাত্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, ওটা কোথা থেকে বের করলে ? ভিজে যায় নি ?

পাতলা কি একটা আস্তরণ, সেটা খুলিতে খুলিতে আরতি উত্তর করিল, না, ওটা আমার অন্তরের জিনিস, প্রাণের পাশাপাশি লুকানো ছিল, ভিজলে তো প্রাণও ভিজে যেতে পারত, নয় কি ? বল না ? ও, তুমি আবার দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র ; বলবে—প্রাণ জলে ভেজে না, অনলে পোড়ে না।

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া আবার বলিল, এক ধরনের অনলে কিন্তু পোড়ে প্রাণ, না গা ?

মনুজ হাসিয়া বলিল, তুমি আজ হঠাৎ বড় বাচাল হয়ে উঠেছ আরু।

আজ বিকেল থেকে কেমন যেন হতে ইচ্ছে হয়েছে, তুমি অনেক কথা বাকি থাকতেই তখন উঠে এলে কিনা ; তার ওপর আবার এই চমৎকার বর্ষার রাত্তির।

হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিও হতে না বাচাল, কাকার কাছে যদি অমন দাবড়ানিটা না খেতে ? বল না ?

কৌতুকায়ত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল, চাঁদে জ্যোৎস্নার মত তাহাতে অফুরন্ত হাসি যেন জমানো আছে।

মনুজ অনুভব করিল, ক্রমশ তাহার জিহ্বাটাও বেশ সবল হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় কাকার দাবড়ানির জেরটা কাটিয়া আসিবার

জন্যই। হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় একটা দমকা হাওয়া আরতির কোলের ব্যাঞ্জোটার উপর দিয়া বহিয়া তারগুলাকে একসঙ্গে সমস্ত পর্দায় চাপিয়া যেন ঝনঝনাইয়া দিল; একটা তীব্র মিঠা ঝঙ্কারে সমস্ত ঘরটা যেন ভরাট হইয়া গেল। মনুজ বলিল, তোমার সঙ্গিনীও বাচাল হয়ে উঠেছে আরু; তোমাদের দুজনের প্রাণে প্রাণে একটু বিশ্রম্ভালাপ হোক, আমি দুষ্যন্তের মত শুনি চোখ বোজার আড়াল থেকে।

আরতির মুখের ভাবটি নিমেষে নরম হইয়া আসিল, কি একটা যেন সুখের বেদনায়। ব্যাঞ্জোটি কোলে রাখিয়া বুকে চাপিয়া বলিল, হ্যাঁ, শোন, ওর কথা শোনাতেই ও আমায় আজ এই বর্ষার মাঝরাত্রে ঘরছাড়া ক'রে টেনে এনেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঞ্জো রনরনিয়া উঠিল। সে কি সঙ্গীত! মনুজের মনে হইল, চাঁপার আধফুটন্ত কলি হইতে গন্ধের মত আরতির দুইটি হাতের অঙ্গুলিগুচ্ছ হইতে সঙ্গীত ঝরিয়া পড়িতেছে। অবিশ্রান্ত বর্ষার ঝরঝর তালের সঙ্গে ড্রিম ড্রিম ড্রিম—কখন মিলিয়া গলিয়া বেদনাতুর হইয়া এই অশ্রুময়ী রজনীর সঙ্গে এক হইয়া গেল; অতল অন্ধকারে, মিলনের সম্ভাবনার বাহিরে কি যেন একটা চিরবিরহের সুর—অন্ধ, নিষ্ফল অনুসন্ধানের ব্যথায় ভরা! অশ্রুতে মনুজের চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল। একটা তন্দ্রায় যেন ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, কেমন একটা ভয় হইতেছে, এই আসন্ন নিদ্রার মধ্য দিয়া সে এমনই একটা অতলে গিয়া পড়িবে যে, সেখান হইতে আর শত চেষ্টাতেও আরতির নাগাল পাওয়া যাইবে না। তবু এই না-পাওয়ার আশঙ্কা, এও যে কত মধুর, কি যে অশ্রুতে ভরা সুখ—

সুর বহিয়াই চলিয়াছে—রিম ঝিম, রিম ঝিম; কখনও মৃদু, যেন

আর শোনাই যায় না; সহসা কখনও ঝঙ্কৃত, নিজের পূর্ণতায়, নিজের গতির আবেগে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

মনুজ বলিল, আরু, তুমি আমি যেন হচ্ছি নদীর দুটি কূল; মাঝখান দিয়ে এমনই চিরবিরহের ধারা আমাদের দুজনকে চিরকালের জন্যে এক ক'রে চলুক। মন্দ কি আরু?

হঠাৎ একটা প্রবল ঝনঝনানির পর সঙ্গীত থামিয়া গেল। আরতি চেয়ার ছাড়িয়া ব্যাঞ্জো রাখিয়া আসিয়া চৌকির নীচে মনুজের সামনেটিতে বসিল; দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, তোমার কাকা চিরকাল নদী হয়ে আমাদের তফাত ক'রে রাখুন, আর তুমি দিব্যি থাক তোমার তপস্যা নিয়ে। তবে ওই রইল তোমার ব্যাঞ্জো, কি যে সাধ!

মনুজ মুখটি কাছে আনিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, আমার যে কি তপস্যা, কি সাধ, তুমিও কি জান না আরু?

হাসিতে আরতির কিছু অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে, কিছু চোখেই টলটল করিতেছে, সেটুকু আদর করিয়া মুছাইতে গিয়া মনুজের হাতটা খানিকটা শূন্যে গিয়া ভারী হইয়া গেল। পতন হইতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে দেখিল, একটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। মনে হইল যে, অ্যালার্মের শেষ ঝঙ্কারের সুর তখনও হাওয়ায় কোথায় একটু ভাসিয়া বেড়াইতেছে। খানিকক্ষণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে বর্ষা, মাথার কাছের জানালাটা খুলিয়া গিয়া সজোরে আর্দ্র বাতাস আসিতেছে। চৌকির একধারে আসিয়া পড়িয়া ছিল, আর একটু হইলেই হইয়াছিল আর কি!

বই লইয়া সাধনা করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না; মনে হইল, যেন এখনও আরতি নীচে, বুকের কাছটিতে বসিয়া আছে। আবার এমনই

একটি স্বপ্নের মধ্যে একবার ভাল করিয়া তাহাকে যদি পাওয়া যাইত—এই আশায় জড়িমা কাটিবার পূর্বে মনুজ আবার তাড়াতাড়ি আরতির বিদ্রূপে সরসিত সেই সঙ্কীর্ণ চৌকিটায় শুইয়া পড়িয়া নিদ্রার সাধনায় লাগিয়া গেল। ব্যাঞ্জোর প্রত্যাশায় ঘড়িটাতে অ্যালার্মের জন্য একটু দমও দিয়া দিল, অবশ্য বাঁ দিকে চাবি দিয়াই।

পরের দিন কাকা বলিলেন, নাঃ, রাত জেগে পড়াটা তোমার পক্ষে এখন ঠিক হবে কি না, সে সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারছি না, ভেবে ভেবে কাল আমারই ঘুম হয় নি, তাইতে শরীরটা এত খারাপ হয়েছে—থাক্ না হয়, দু-একজন ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। ঘড়িটা আপাতত আমার ঘরেই রেখে এস।

কাকীমা কুটনা কুটিতেছিলেন, মুখ অন্ধকার করিয়া মনুজ পাশে গিয়া বসিল। একবার আড়চোখে দেখিয়া বলিল, অত আলু কি হবে? আজ সাতজনের তো মোটে রান্না।

কেন, আজ আবার অষ্টম জনটির কি হ'ল?

মনুজ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, নাঃ, কাজ কি কিছু হয়ে, মেনো তো মানুষ নয়! এই এক রকম হুকুম, তক্ষুনি আবার অন্য রকম! কত ইয়ে ক'রে কত রকম কত কি ক'রে যদি আরম্ভই করলাম একটা সাধনা, দু দিন দেখাই যাক; না, 'ঘড়ি আজ আমার ঘরে দিয়ে আসিস'! কেন, সব থাকতে ঘড়িটার ওপরই এত আক্রোশ কেন? ও তো কারুর ব্যাঞ্জোও নয়, এস্রাজও নয়, আমি কক্ষনও রেখে আসব না। না হয় ব'লে বেড়াবে, ভাইপো আমার অবাধ্য হয়েছে। বেশ, হয়েছে তো হয়েছে। আমার তপস্যার—সাধনার ঘড়ি, ও আমি কোনমতেই ছাড়ব না, একটা মায়া জন্মে যায় না?

নবোঢ়ার পত্র

নম্বর এক

সৈ,

তোমায় চিঠি লিখতে কেমন বাধ বাধ ঠেকছে ভাই। কথায় বলে, হেলে ধোত্তে পারে না কেউটে ধোত্তে যায়। আমারও হোয়েচে তাই। দাদার অত মার কানমলা খেয়েও আমার দ্বিতীয় ভাগ শেষ করা হোলো না, অথচ তোমার মত ইস্কুলে-পড়া মেয়েকে এই প্রকাণ্ড চিঠিখানা লিখচি। তা তোমারই দোষ। কেন অমন হাতে ধরে বোলেছিলে। আমি যত মুস্কিলে পড়ি বানান নিয়ে ভাই। তা প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগে যতটুকু পড়েচি তার মধ্যে ভুল হোলে রাগ কোরো। না হোলে কোরো না ভাই।

বিয়ের রাত্তিরে আমার মনে যা যা হয়েছিলো তোমায় তো বোলেইছি, আর বাসর-ঘরের কথা তো জানই। তারপর কি হোলো বলি শোনো। না ভাই, তোমাদের বোসজা বড় বেহায়া লোক ভাই। ভিড় হোয়েছিল বলে আমরা মেয়ে-গাড়িতে উঠেছিলুম। ও প্রোত্তেক ইষ্টিশানে চা খাবার কি জল খাবার নাম করে নেমেচে। তুমি বোধ হয় বোলবে, এ আর কি বেহায়াপনা হোলো। বেটাছেলে কি আমাদের মত ঘোমটা টেনে থাকবে। কিন্তু ভাই ঠিক মেয়ে-গাড়ির সামনেই কি যত রাজ্যির সব পান-ওলা চা-ওলা আর জল-ওলা আসে যে ওখানে না দাঁড়িয়ে আর ডাকা যায় না! তা আমিও সেয়ানা মেয়ে। যেমন বাঘা ওল তেমনি বুনো তেঁতুল। ইষ্টিশান আসছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে একগলা ঘোমটা টেনে দিয়ে বোসে আছি। দেখো কাকে দেখবে। ও ভাই না পেরে শেষকালে কোল্লে কি জানো? একটা

ইষ্টিশানে এসে একেবারে আমার জানলাটির কাছে এসে দাঁড়ালো। বোললে, ঝি দেখ তো তোমাদের ট্রাংকে আমার কোটটা ভুলে চোলে গেছে কি না। আমার ভাই বড্ডই হাসি পেয়েছিল কিন্তু। আচ্ছা তুমিই বিচার করো, ওর জামা আমার বাক্সে কি করে আসবে ভাই। আমিও নাছোড়বান্দা। কাল রাত্তিরে জিগ্যেস করেছিলুম। বললে, ভগবানের কাছে পেরারথনা করি, আজ্জম্মে বেটাছেলে হোয়ে জম্মাও। তা হোলে সব টের পাবে। কি যে কথার ছিরি! এমন আবার হয় নাকি? এক জম্মে বেটাছেলে আর জম্মে মেয়েমানুষ! যদি হোতো তা হ'লে সতীরা শতো শতো জম্ম ধরে এক সোয়ামিকে পায় কি ক'রে? এ কথাটা আমি জিগ্যেস করেছিলুম। তাতে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। তোকে একটা কথা বলি, কাউকেও বলিস নি সৈ। ওর হাসিটা বড় মিষ্টি ভাই।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতে একজন বললে, নাও না গো, বউ কোলে কোরে নাও না। কথাটা বোধ হয় শাশুড়ীকে বোললে। তিনি বোললেন, এস মা। হ্যাঁ ভাই সৈ, আমি কি কচি খুকি যে হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে কোলে উঠতে যাবো? আমি ভাই লজ্জায় আধমরা হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন ছু পা এগিয়ে তিনিই আমাকে কোলে তুলে নিলেন আর বোললেন, পেরথোম কথাটাতেই অবাধ্য হোলে মা? সৈ, তুমিই বিচার করো ভাই, আমার অবাধ্যটা হোলো কোন্‌খানে! মনে ভাই কষ্ট হোলো, কিন্তু অমঙ্গল হবে বলে তাঁর মুখটা— আর বোলব না ভাই, তুমি বোধ হয় হাসচো। কিন্তু এ রকম অবস্থায় ওর মুখ মনে করতে তুমিই শিকিয়েছিলে, তা মনে থাকে যেন। উটোনে বরন আরম্ভ হোলো। উনি তো ছটফট স্থরু কোরে দিলেন। পেটের জ্বালা, তার ওপর আবার রাত্তিরে ঘুম হয় নি। সেই শাঁকের শব্দ,

উলু উলু, হাসি আর ছেলেদের কান্নার সংগে আমার মনের অবস্থা কি হোচ্ছিল ঠিক মনে নেই। তবে একটু আনন্দও হোচ্ছিল। এখন যে বলা হচ্ছে, ঘুম হয় নি শিগগির সেরে নাও, তা কে তোমায় সমস্ত রাত জেগে ফিকির কোরে আমার গাড়ির জানলার কাছে ঘুরে বেড়াতে বোলেছিল মশাই? ঠিক হয়েছে। যেমন কম্ম তেমনি ফল।

তারপর মুখ দেখবার পালা। এ যে কি জ্বালা, তুমি কখন বুঝতে পার নি। তোমায় ভগবান সুন্দর কোরে পাঠিয়েছেন। পেরথোমে দিদিশাশুড়ী দেখলেন, দেখে বোললেন, যা হোগ ছিরি আছে। শাশুড়িও মুখটা তুলে ধোরে দেখলেন। মাথায় একটা টায়রা গুঁজে দিয়ে বোললেন, হ্যাঁ, বোলতে নেই, তবে দু হাজারের মোদ্দে পার করবার মেয়ে নয়। আমার ভাই, গাটা কাঁটা দিয়ে উটলো। এত সাধের শোশুরবাড়ী—এই! পাড়াপাড়সিরাও দেখলে সব। এ পজ্জন্ত যে সব খুঁত কেউ দেখতে পায় নি, সে সব একে একে সবাই বের করতে লাগলো। একজন বোললে, সেজদাদা যে রকম সৌখিন তাতে মনে ধরলে হয়! ইনি হচ্ছেন আমার ছোট ননোদ। একফুট্টে দেখতে কিন্তু কি চেটাং চেটাং বাক্যি ভাই! পেরথোমে তিনজন সঙ্গি নিয়ে ভাব কোরে বোসলো। তোমার নাম কি ভাই? তুমি কি পড় ভাই? তোমার কটি বোন ভাই? একজন বোললে, কথা কও না কেন ভাই? বর পচন্দো হয় নি বুঝি, তাই রাগ হয়েছে। আমার সৈ বড় লজ্জা করতে লাগলো। আর ভয়ও হোতে লাগলো, কথা কইলে নিশ্চয় ছল ধোরবে। অমনি আবার ক্ষুদে ননোদটি গোমড়া মুখ করে বলে উটলেন, চল লো চল, অত ঠেকার সয় না। হ্যাঁ ভাই সৈ, তুমিই বিচার করো। তোমরা তো আমায় চিরকালটা দেখে আসছো। আমি কি ঠেকারে? শেষে ভাই কথা কইতে হোলো। সব কথা বললুম।

অনেক গপ্পসপ্প হোলো। আমার বাঘিনী ননোদিনীর কিন্তু এত সৈল না। গা দুলিয়ে উটে যাওয়া হোলো, আবার বলা হোলো, কি বাচাল মেয়ে বাবা, এমন দেখি নি।

কি জায়গা ভাই! এখানে চুপ করে থাকলে হয় ঠেকারে। কথা কইলে হয় বাচাল। দেরি করে খেলে বলে নবাবের মেয়ে। তাড়াতাড়ি খেলে বলে হ্যাংলাটে। হাসলে বলে বাপের বাড়ির কথা একদিনে ভুলেছে। কাঁদলে বলে কি প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে। সৈ, তুই তো শোশুরবাড়ি গেছিস। আর সব বোলে দিলি, এখানে কি কোরে থাকতে হয় সেইটুকু বোলে দিলি নি কেন? আমি ভাই যেন হাঁপিয়ে উটলুম। খাওয়া দাওয়ার পর যখন বিছানায় গিয়ে পোড়লুম তখন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। লোকে কেন ভাই যমের বাড়ী যা না বলে শোশুরবাড়ি যা বলে না সৈ?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সৈ তোমার সপ্ন দেখছিলুম। যেন ঘোষেদের পুকুরে দুজনে ঝাঁপাই জুড়চি। হঠাৎ আমি তলিয়ে গিয়ে একটা বিজোন পাতালপুরিতে চোলে গেচি আর তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। মনটা কি যে কোরছিল সৈ কি বোলবো! সেখানে না আছে হাওয়া না আছে মানুষ। শুন্নো বাড়ি যেন রাক্কোসের মতন গিলতে আসচে। আমার ছোট দেওরটি বেঁচে থাক। তার পড়ার চেঁচানির চোটে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। যেন নিশ্বেস ফেলে বাঁচলুম। হ্যাঁ, এ দেওরটির কথা তোমায় বলি নি। আমি এসেছি পজ্জন্ত এর পড়ার ধুম পড়ে গেচে, তাও নিজের ঘরে নয়। আমি যেখানে বসবো সেইখানে এসে পড়া চাই। একবার একলা পেয়ে গট গট কোরে এসে জিগ্যেস করলে, এটা পড়িয়ে দিতে পারো বৌদি? সে ইংরিজি বই। কি সব হিজিবিজি নেকা। কোত্থেকে বোঝাব ভাই। বোললুম আমি

যে ইংরিজি জানি না ভাই। ওমনি বুকটা একটু উঁচু কোরে বোললে, হুঁ, বড় শক্ত এটা, কেউ বোলে দিতে পারে না। এ বাহাদুরি দেখে আমার বড় হাসি পেলে। কেউ ছিল না দেখে জিগ্যেস করলুম তোমার দাদাও কি পারে না? দুষ্টু অমনি বোললে, কোন্ দাদা? যে তোমার বর? ও ত ফেল হোয়ে গেছে। বড়দাদাও পারে না। এ বড় শক্ত পড়া। কথাগুলো আমার ভাই বড় মিষ্টি লাগছিলো। ঘাঁটাবার জন্যে বোললুম, আমি এসব কথা তোমার সেজদাদাকে বোলে দোবোখন। সে বোললে, তুমি তো ওর সংগে কথা কও না কি কোরে বোলবে? এ কথার কি জবাব দেবো। বেটাছেলেরা সৈ ছেলেবেলা থেকেই দুষ্টু। ওদের কথার জবাব দেওয়া যায় না।

এমন সময় খুড়-শাশুড়ি ঘরে ঢুকে বোললেন, কি গো, নবাব খান্জা-খাঁর ঝি, ঘুম ভাঙলো? সুজ্যি ঠাকুর যে পাটে বোসলেন! সংগে সংগে সেই খুদে ননোদটিও এসে দাঁড়ালেন। বোধ হয় এতক্ষণ নিজে ঘুমোচ্ছিলেন। ফুলো ফুলো চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে বোললেন, তোমাদের বউটি একটি ছোটখাট কুম্ভকর্ণ খুড়িমা। তাই না তাই— বলে খুড়-শাশুড়ি চলে গেলেন। তুমিই বিচার কর সৈ। সমস্ত রাত গাড়িতে এলে ঘুম পায় কি না। তবু আমি ওঁর দাদার মতন হৈ হৈ কোরতে যাই নি। সৈ ভাই, তোমায় যদি সংগে পেতুম, এই রায়-বাঘিনিকে দু কথা বেশ শুনিয়ে দিতুম। থোঁতা মুখ ভোঁতা কোরে দিতুম। না ভাই সত্যি, আমার বড় রাগ হোচ্ছে। ননোদ কি আর কারু হয় না!

সেই দিন ফুলসজ্জে ছিল। তোমার কথা মতো অমি চেষ্টা কোরেছিলুম না কথা কইতে, কিন্তু শেষ পজ্জন্ত কথা কওয়ালে তবে ছাড়লে। আমি তো বোলেইছি ওদের সংগে পারবার জো নেই।

না ভাই তুমি রাগ কোরো না। ফুলসজ্জের কথা আমার একটিও মনে পড়ছে না যে তোমায় লিকবো।

যখন যাবো পারি তো মনে কোরে কোরে বোলবো, এখন সপ্নের মতন আবছাওয়া আবছাওয়া এলোমেলো মনে পড়ছে। শুধু সেসব গুচিয়ে নেকা ভাই আমার বিদ্যেয় কুলোবে না। তবে এক কথা বোলতে পারি। বাসরঘরে চুপ কোরে ছিলো বোলে ভেবো না যেন তোমাদের বোসজা একটি গোবেচারি। বেহায়ার একশেষ ও। আর কাকেই বা দোষ দোবো ভাই। ওদের জাতটাই ওই রকম। এই পোরস্থ রাত্তিরে বউভাত ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর ওর বন্ধুরা মুখ দেখতে এলো। তাই বাপু ভাল মানষের মতন মুখ দেখে চলে যা, তা নয়। নানান রকম তামাসা কোরে আমায় হাসিয়ে তবে গেলো। কাকে দুষে কাকে ভাল বলবো ভাই। ও চোর বাছতে গাঁ উজোড়। কাল সকালে শরীরটা বড় খারাপ ছিল। আর শরীরেরই বা দোষ দি কি কোরে! শুয়ে শুয়ে এলিয়ে এলিয়ে বেড়িয়েছি সমস্ত সকালটা। তবে ভাগ্যি বলতে হবে যে কেউ তেমন লোক্ক্যো কোরছিলো না। আগের রাত্তিরে খেটে সবারই এই দশা হোয়েছিল। আর আমার খুদে ননোদ তো দশটার আগে উঠতেই পারেন নি। বাবা ননোদ নয় তো, যেন কি! যাই বোলিস সৈ, ওর কথা মনে হোলেই একটা গাল দিতে ইচ্ছে করে আমার।

এইবার সৈ তোকে একজনের কথা বোলবো সে রকম লোক আর ভুভারতে খুঁজে পাওয়া যায় না। অবিশ্যি তুমি ছাড়া। আমি অকাতরে দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছি এমন সময় আস্তে আস্তে আমার গা ঠেলে জাগালে। পেরথোমে মনে হ'ল তোমাদের বোসজা। ও আজকাল সুবিদে পেলেই ঘরে ঢুকে ওই রকম জালাতন করে। অসজ্জি।

কিন্তু চোখ চাইতে দেখি তা তো নয়, এ যে এক নতুন লোক। আমার মুখের দিকে কি এক রকম ভাবে চেয়ে আছে। আমিও পেরথোমটা কিছু বলতে পারলুম না। তার পরে সে নিজেই কথা কইলে। পেরথোম কথা, বাঃ, তোমার মুকখানি তো বড় স্থন্দর ভাই। শোশুর-বাড়িতে এ কথা দ্বিতীয়বার শুনলুম। কিন্তু ভাই সৈ বলতে কি পেরথোমবার যার মুখে শুনেছিলুম তার মুখেও এত মিষ্টি লাগে নি। লজ্জায় আর চাইতে পারলুম না। তখন মুখটা তুলে নিয়ে বললে, দেখি, রাগ করবে না তো ভাই। কাঁচা ঘুমে তুললুম। রাগ আর কি কোরব সৈ। এই চারিদিকের গন্‌জনার মোদ্দে এঁর আদরের কথা-গুনোয় আমার মনে যে কি হোচ্ছিল তা অন্তোজ্জামিই জানেন। আমি বললুম, না, কেউ থাকে না তাই ঘুমুই। আপনারা যদি মাঝে মাঝে একটু আসেন। তিনি বোললেন, আমায় আর আপনি বোলে ডেকো না ভাই। তোমায় দেখে আমার বড্ড ভাল লাগচে। আপনি বোলে ডাকলে কেমন পর পর বোধ হয়। আমার ভাই মনে হোচ্ছিল এ কি এই পৃথিবীর লোক! এক কথায় এত আপন করে নিতে কেউ তো পারে না। আর কি পিরতিমের মতন চেয়ারা ভাই। আমার হাতটা মুটোর মোদ্দে নিয়ে বললেন, আমার বাড়ী কাছেই। কদিন থেকে আসবো আসবো কোরছি কিন্তু হোয়ে উঠছে না। বোলতে বোলতে চোক ছল ছল কোরে উটলো। কি এক রকম হয়ে গিয়ে খপ কোরে চোখে কাপড় দিয়ে বোললেন এই চোখের জল এক পোড়া আপোদ হোয়েছে। আমি তো একেবারে কিম্ভূতকিমাকার হোয়ে গেলুম। এ রকম কক্ষনও দেখি নি। একটা কথাও কইতে পারলুম না। চোখ দুটো মুছে জিজ্ঞেস কোরলেন, তোমার নামটি কি ভাই? আমি নাম বললুম। তিনি বললেন, শৈল, তা বেশ নামটি, সৈ বলে

ডাকলে হয় ভাল। তবে তোমায় ও নামে ডাকবো না ভাই। এস আমরা একটা কিছু পাতাই। আবার সেই আমুদে ভাব দেখে আমার সাহস হ'ল। বোললুম, বেশ তো আমিও একটা আপনজন পেলে বাঁচি। একেবারে মন টেকে না। হেসে তিনি বোললেন, কেন ভাই লুকোচ্চো? দিনের বেলা যেটুকু কষ্ট হয় রাত্তিরের আপনার জন কি সেটুকু পুষিয়ে দেয় না? আমি লজ্জায় আর হাঁ না কিছুই বোলতে পারলুম না। হাতটা একটু টিপে মুখটা এগিয়ে নিয়ে বোললেন, উত্তোর দাও ভাই। কথা না কইলে কি কিছু পাতানো যায়। আমি বোললুম, জানেনই তো সমস্ত রাত ঘুমুতে না দিলে দিনের কষ্ট বাড়ে কি কমে। আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে ভারি আওয়াজে বললেন, আমি জানি নে ভাই, আর এ জন্মে জানবোও না, তাই নারীজন্মের এই সাথ্যক স্থখের কথা দুটো শুনতে তোমার দারস্ত হোয়েছি। আমি বয়েসটার আন্দাজে কথাটা বোলেছিলুম, এখন দেখলুম মাথায় সিঁদুর নেই। আমি ধিক্কারে যেন মাটিতে মিশিয়ে গেলুম। কেন না দেখে শুনে কথাটা বোললুম? কিন্তু কিছু বুঝতে পারলুম না। বিয়ে হয় নি, দুদিন পরে হবে। কিন্তু অমন কথা বোললেন কেন? তিনি গলাটা ঝেড়ে সামলে বোসলেন। বোললেন, পোড়াকপালি আমি যার কাছে দুদণ্ড বোসি তার কাছেই অশান্তি আনি। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। পৃথিবীতে হাসা অনেকেরই কাছে যায় কিন্তু কাঁদা সবার কাছে যায় না। তোমার ঘুমন্ত মুখখানা দেখে যেন বোধ হোলো তুমি আমার কান্না বুঝবে। তাই আর চোখের জল মানা মানচে না। কে জানে কেন এমনটি হয়! আমি বোললুম, কিন্তু আপনার এ কান্না কিসের জন্যে? আমারও বুকের ভেতরটা কি রকম করছে যে। কিছু তো বুঝতে পারছি না। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বোললেন,

কি বোলব আর ভাই। যে দয়া কোরে তোমার সিঁথিটি সিঁদুর দিয়ে রাঙা কোরে দিয়েছে সে নিষ্ঠুর হোয়ে আমার চোখের জল ভোরিয়ে দিয়েছে। কত জল সে দিয়েছে বোলতে পারি নে। যেন আর ফুরোতে চায় না। আমি আর থাকতে পারলুম না সৈ। হাত দুটো ধরে মিনতি কোরে বোললুম, আমায় বোলতেই হবে কি হোয়েছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। তিনি খানিকক্ষণ ধোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রোইলেন। কি সে আদরমাখা চাউনি ভাই! আমি যে কোথায় আছি তা সে চাউনিতে আমায় ভুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর বোললেন, সে সব কথা তোমার যে ভাল লাগবে না ভাই। আমি জিদ কোরতে লাগলুম। তিনি বোললেন, বেশ বোলবো 'খন একদিন। এখন আমাদের পাতানোটা হোয়ে যাক। বোলে রাঙা মুখটা আর চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছে একবার আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। যেন সে মানুষই নয়। আমি বোললুম, বেশ তো। তিনি বোললেন, তুমি ভাই আমার পথের কাঁটা, আমিও তোমার তাই, কেন না তোমার সুখের পথে মাঝে মাঝে ফুটবো—বোলে হাসতে লাগলেন। কিন্তু সে হাসি কি কান্না ঠিক কোরতে পারলুম না।

এমন সময় আমার শাশুড়ি আর কে একজন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। দুজনেই বোলে উঠলেন, এই যে। আর আমরা সমস্ত বাড়ি এক কোরে বেড়াচ্ছি। তার পরে শাশুড়ি আমায় বোললেন, বোলি বড় মানষের ঝির নিদ্রে হোলো? এ সব অলুক্ষুনে ওব্যেশগুনো ছাড়ো বাছা। কি বেয়াড়া রীত দেখ তো ভাই। বাপ মা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। এগুনোও শেকাতে পারে নি। শেষের কথাগুনো সঙ্গির দিকে চেয়ে বললেন। সঙ্গি বললেন, কে জানে দিদি আজকালকার মেয়েদের ধাত বুঝতে নারি। তবে এ বাড়িতে

থাকলে সব শুদরে যাবে। কিন্তু ভয় হয় আমাদের উনি আবার জুটেছেন। বোলি হ্যাঁলা ছিষ্টির পাট সব পোড়ে রয়েচে আর দিব্যি নিশচিন্দি হয়ে কোনে-বউয়ের সঙ্গে কোনে-বউ সেজে বোসে আছিস। আমার যে আর সয় না। হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল। আমার তো সৈ মনে হোচ্ছিল মা ধরনি দিধা হও। আমার পথের কাঁটা কিন্তু হেসে বললে, চল আমি যাচ্ছি। ওরা দুজনে রাগে গনগন করতে করতে চলে গেলেন। আমার গলাটা জড়িয়ে চুমো খেয়ে পথের কাঁটা বললে, কিছু দুঃখু কোরো না, এ আমার অঙ্গের ভূষণ। আজ তবে এখন আসি ভাই।

তিনি চলে গেলেন। সমস্ত দিন আমার মনটা কি রকম যেন হোয়ে রইল। আমি ঠিক কিছুই বুঝতে পারলুম না। তবে মনে নানান রকমের কথা উটতে লাগলো। রাত্তিরে সমস্ত কথা বোলে তোমাদের বোসজাকে জিগ্যেস করলুম। সে একটু যেন কি রকম হয়ে গেল। অন্যমনস্কো হয়ে হাতের ফুটন্ত গোলাপ ফুলের পাপড়িগুনো ছিঁড়তে লাগলো। তারপর একটা নিশ্বেস ফেলে হঠাৎ পাপড়িগুনো আমার মুখে ছড়িয়ে বোললে, ও কিছু নয়। তুমি ছেলেমানুষ শুনতে নেই। সে রাত্তিরে কিন্তু সবই যেন বিস্বদ লাগতে লাগলো। হাজার চেষ্টা করেও জমাতে পারলে না। কথায় কথায় কেবলই ভুল হতে লাগলো। একবার বোললে, আজ একটা ভালো গোলাপ ফুল এনেছি। তোমার মুখের কাছে ধরে দেখবো কোনটা বেশি সুন্দর। বোলে বিছানাটা হাৎড়াতে লাগলো। আমি বললুম, সেটা তো ছিঁড়ে আমার মুখে ছড়িয়েচো, আর পাবে কোথায়? অপ্রোসতুত হয়ে বললে, হ্যাঁ ঠিক কথা। তা যাই হোক তোমার মুখের কাছে কিছুতেই মানাতো না; সৈ এবার আমার চিঠি বন্দ করি

ভাই। পেরকাণ্ডো হয়ে পড়ল। এখন এক আনার ডাকে গেলে বাঁচি। আমরা এখানে ভাল আছি। তোমরা সব কেমন আছ লিখবে। তুমি আমার ভালোবাসা জেনো আর মিনি বেড়ালটাকে আমার হোয়ে গুনে গুনে একশোটা চুমো খেও। সেটার জন্যে বড়ই মন কেমন করে ভাই।

ইতি—তোমার সৈ

নম্বর দুই

ভাই সই,

আজ বারো দিন হোলো নদীতে বান এসে সমস্ত দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে। ও বোললে, এখন চিঠিপত্তর যাওয়া বন্ধ। কাজেই তোমার পেরথোম চিঠিটাও পাটানো হয় নি। এইখানেই প'ড়ে রয়েছে। আর চিঠির লিখনে-ওলারই যাওয়া হোলো না তো চিঠির। এই গেল সোমবার যাওয়ার দিন হয়েছিলো। কিন্তু কথায় বলে বিধি যদি হোলো বাম কেই বা পুরে মনস্কাম। কয়েক যায়গায় নাকি রেলের লাইন ভেঙে গেছে। গাড়ি বন্দ। তা যেখানে চিরজম্মটা থাকতে হবে সেখানে পেরথোমবার না হয় দুদিন বেশিই থেকে গেলাম তাতে দুঃখু নেই। কিন্তু ভাই ঠাট্টা না কর তো বোলি। আজ আট দিন হোলো তোমাদের বোসজা চলে গিয়েছে পজ্জন্ত মনটা যেন আইঢাই করছে। আমি ভাই তোমাদের ভালোবাসা না বাসা অতশত বুঝি নে। তবে এ বাড়িতে ওরই মুখে একটু হাসি দেখতুম। আর সব যেন তোলো হাঁড়ি নামিয়ে বসে আছেন। বিশেষ করে ননোদটি। বাবা বাবা বাবা সাজ্জম্মে কারুর যেন ননোদ না হয়!

তা ভাই এক হিসেবে আমার কোনো দুঃখু নেই, কেননা উনি

গেছেন খুব ভাল কাযে। বন্নেতে যাদের ঘর বাড়ি পড়ে গেছে গোরু বাছুর ভেসে গেছে খাবার পরবার সংস্থান নেই তাদের দেখতে শুনতে ওঁরা সব দল বেঁধে গেছেন। আমি গোড়ায় এত জলের কথা শুনে শিউরে গিছলুম। ওঁর পা দুটো জড়িয়ে বলেছিলুম, কোনমতেই যেতে পারবে না। কিন্তু ভাই এমন করে গরিবদের কথা সব বলতে লাগলেন যে আমা হেন পাষাণেরও চোখে জল এল। পা দুটো ছেড়ে দিলুম। মনে কললুম মা জগদম্বা যদি ইচ্ছে করেন তো আমার সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখবেনই। ভাল কাযে বাধা দিতে নেই। যাবার সময় মার দেওঁয়া ছিখেত্তোরের ফুল আর পেসাদ পকেটে রেখে দিলুম।

না ভাই আর যাই বলো পুরুষদের একটা বড় দোষ। ঠাকুর-দেবতায় মোটেই বিশ্বেস নেই। এ ফুলে কি হবে বলে হাসতে লাগলো। আমিও তেমনি কড়া মেয়ে। খুব কোসে এক ধমক দিয়েছি। তুমিই বিচার কর সৈ হিঁদুর ঘরে এত বাড়াবাড়ি কি ভালো? ঠাকুর-দেবতার কাছে অপরাধ কোরে কি একটা বিগ্নি ঘটাতে হবে শেষে? আমার দিনগুনো যে কি কোরে যাচ্ছে তা আমিই জানি। আজ আট দিন গিয়েছে। কোন একটা খবর নেই। পথের কাঁটার শরীরটা তেমন ভাল না। তবুও বেচারী পেরায় রোজ দুপুরবেলায় আসে। ওইটুকু সময় যা একটু অন্যোমনস্কো থাকি। ওর পেট থেকে কিন্তু সেই কথাটা বের করতে পারছি না। বললেই বলে, নিরিবিলি পেলে একদিন বোলবোখন। সেদিন চেপে ধরতে আমার গাল দুটো টিপে ধরে বললে, একে তোমার বিরহের কষ্ট তার ওপর দুঃখুর কথা সইবে কেন কাঁটা এই তো কচি বুকখানি! আমি বললুম বেশ তো বিষে বিষোক্ষয় হয়ে যাবেখন। বল তুমি। আমার গলা জড়িয়ে বললে, তোমার বরের নামে নালিস। আগে আসামি আসুগ জজসাহেব,

তবে তো মকদ্দমা হবে। আমি সৈ কিছু বুঝতে পারছি না। উনি তো অমন লোক নন। তবে কেন পথের কাঁটা অমন অমন কথা বলে। আমার বুকটা ভাই বড় ভারি হয়ে থাকে। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে সৈ তোমার গলাটা জড়িয়ে তিনঘণ্টা ধরে কাঁদি কাঁদি আর কাঁদি। কাল কেঁদে কেঁদে বালিস ভিজিয়েছি, তবু মনটা হালকা হয় নি। একবারটি ভাব তো সৈ কি কঠিন না প্রাণ আমার! ওর কোন খবর নেই। পথের কাঁটাও রোজ আসে না। ননোদিনি কাল-সাপিনির তো ওই দশা। বাড়িতে কেউ একটু আদর করে না। তার পর ওদের ছেলে খবর পাটান না—সেও আমারই দোষ। কাল দিদিশাশুড়ি আমায় শুনিয়ে শুনিয়েই বললেন, বোধ হয় বউ পছন্দ হয় নি ব'লে বিবাগি হোয়ে গেছে। অমংগলের কথা শুনে আমার বুকটা ধড়াস করে উটল। আগে এই দিদি-শাশুড়ি কাছে ডেকে ঠাট্টা তামাসা করতেন, একথা সেকথা রোজ জিগ্যেস করতেন। কিন্তু এদান্তি এঁরও ধরন বদলে গেছে। তা সৈ সত্যিই কি আমি এতই কুচ্ছিত? শুনেছি আজকাল টাকা না ঢাললে রূপ হয় না। তা ভাই বাবা কমই বা কি দিয়েছেন? বলতে কি কিচ্ছুতেই যশ নেই। কাল সন্দের সময় ননোদ এসে বললে, কি গো দাদার কোন চিঠিপত্তর এসেছে? আমরা তো পর হয়ে গেছি। বোঝো সৈ কথাটার ধরন বোঝো। তাই বলছিলুম পোড়া প্রাণ এতোতেও বেরোয় না। রূপকথার কোন্ ভোমরার বুকে আমার এ প্রাণ গচ্ছিত আছে বলতে পারিস সৈ?

আজকাল রোজ এইরকম কোরেই কাটছে। সমস্ত দিন হতচ্ছেদ্দা লাঞ্ছোনা সই। রাত্তিরে সবাই যখন শোয় তোমায় বোসে বোসে একটু কোরে লিকি। এইটুকু আমার শান্তিতে কাটে। তবুও ভয়ে ভয়ে লিকতে হয় ভাই। মেঝেতে ঝি শুয়ে রয়েছে আর বিছানায় আমার

সেই ননোদ। সাক্ষাৎ যম। কেউ উঠলেই আমার মাথায় বজ্রাঘাত। তবে ভগবান দয়া কোরে দুজনের চখ্যেই কুম্ভকর্ণের ঘুম দিয়েছেন। আর নয় ভাই, শুইগে। চোখ ঢুলে আসছে, কাল আবার লিকবো অখন।

শনিবার। সৈ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আজ ওর একখানা চিটি এসেছে। একখানা কেন বলি দুখানা চিটি এসেছে। একখানা বাড়িতে দিয়েছে আর একখানা আমায়। না ভাই আমার বড়ই লজ্জায় লজ্জায় দিনটা কেটেছে। ঝি পোড়ারমুখী আবার সব্বার সামনে চিটিটা দিয়ে বকসিস চায়। আহা কি উবগারই করেচো তার আবার বকসিস। যদি খেঁমতা থাকতো তো এ রকম কোরে লজ্জা দেবার দরুন হেঁটোয় কাঁটা সিয়রে কাঁটা দিয়ে পুঁততুম তোমায়। কিন্তু কি কোরবো ভাই, শেষ পজ্জন্ত একটা টাকা আদায় কোরে ছেড়েছে। আবার ভয় হচ্ছে কাউকে বোলে না দেয়।

আচ্ছা আমায় তোমাদের বোসজার এ রকম কোরে বিব্রত করা কেন ভাই? কে মাথার দিব্যি দিয়ে ঢং কোরে চিটি লিকতে বোলেছিলো আবার? সে আবার কাব্যি দেখে কে! সেখানে খাবার দাবার কষ্ট সে কথা সোজা কোরে বোললেই হয়। তা নয়। তোমার অধরসুধা আমায় অমর করিয়া রাখিয়াছে নহিলে এ কঠোর ক্লেশ এ জীবন সহিতে পারিত না। বেশ বেশ বাবু বুঝেচি। এখন তুমি ফিরে এস। না হয় সে সুধা আরও একটু দেওয়া যাবে। কি বল সৈ। সেখানে বোসে বোসে খালি পেটে কাব্যি লিখতে হবে না। হ্যাঁ ভাই সৈ মৃণাল মানেই বা কি আর ভুজ মানেই বা কি ভাই? কতকগুলো পদ্মের ডাঁটা ভেসে যাচ্ছিল দেখে নাাক আমার মৃণাল ভুজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মশায়ের ঘুম হয় নি। আমার তো বিশ্বেস কিছু ঠাট্টা করেছে। ওসব লোককে পেত্তয় নেই। তাই যদি

হয় তো নিজের ঘাড়েই উল্টে পড়বে। কেন না আমি তো বুঝতে পারচি না। কি বল সৈ। যা হোক ভাই শিগগির শিগগির ফিরে আসবে লিকেচে এই আমার পুণ্যির বল। এলে যার ভাই তার হাতে সঁপে দোবো। আঁচলে বেঁধে রাখবেখন। আর বোলতে পারবে না যে আমি পর কোরেচি।

ভাই পথের কাঁটা আজ হুদিন আসে নি কেন। কাকে যে জিগ্যেস করি। প্রাণটা তার জন্যে বড় উতলা হোয়েচে। আহা বেচারার মা নেই। সৎমার হাতে কি শাসনটাই না ভোগ করে। এখন ভাই আসি তবে।

সোমবার। সৈ ন দিন পরে আবার কলম ধরেছি। কিন্তু লিকতে কলম আর সরে না ভাই। সৈ সত্যি আমার পোড়া কপাল ভাই। নৈলে আজন্ম শিবপূজো কোরে পাওয়া এমন সাদের শোশুরবাড়িই এমন শত্তুরপুরি হোয়ে দাঁড়াবে কেন। আর কেনই বা ভগবান যা একটু হাত তুলে দিয়েছিলেন তাও কেড়ে নেবেন। কি কোরে কথাটা তোমায় বোলবো সৈ। আমার যেন সব এলোমেলো হোয়ে আসছে। ও আজ পাঁচ দিন হোলো এসেছে। সকালে এল। বিকেলবেলা ঘরে বোসে আমার সঙ্গে গল্প কোরচে এমন সময় পথের কাঁটা দোরে এসে দাঁড়ালো। ওর গল্পসল্প একেবারে বন্ধ হোয়ে গেল। আমি ঘোমটাটা টেনে দিয়ে ভেতরে থেকে দেখতে লাগলুম কাঁটা ঢলঢলে চোখ হুটি দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আর ও মাথাটা নামিয়ে আমার বালাটা আস্তে আস্তে ঘুরুচ্চে। আমার একটু হাসি পেলে। তিন জনকেই কে যেন মন্তোর পড়ে পাথর কোরে দিয়েছে। আমি ওর হাতটা টিপে দিলুম, দিতেই ওর যেন সাড় হোলো। তাড়াতাড়ি উঠে কাঁটাকে বোললে, এসো বসো। এই হুটি কথা বোলতে আওয়াজ এত

জড়িয়ে যেতে আর কখনো আমি দেখি নি। ও চোলে যেতে কাঁটা এসে বোসলো। আমার ঘোমটাটা খুলে দিলে। গাল দুটো টিপে বললে, দুজনের মুখ দুটি একসঙ্গে দেখলেও একটু তৃপ্তি হোতো তাতেও বাদ। মুখটি ঢেকে রাখলে। তোমার পথের কাঁটা নাম দেওয়াই ঠিক হোয়েছে। আমি বোললাম, এদ্দিন কোথায় ছিলে ভাই? যখন ভোলো তখন একসঙ্গে সক্কলেই ভোলো। এদেশের কি ধরনই এই। কাঁটা বললে তোমার বিমর্ষ শুকনো মুখখানির দিকে আর আমি চাইতে পারতুম না ভাই। আর আসসাসের কথাও সব ফুরিয়ে এসেছিলো। তা ভিন্ন আমার শরীরটাও ভালো থাকতো না। অবিশ্যি সেটা কিছু নয় তেমন। আমি বোললুম কি হোতো আবার? শরীরকে যে শরীর বলো না তুমি তা আমি জানি। সে বোললে, বিশেষ কিছু নয়, শুধু তোমার বিরহরোগের আঁচ লেগেছিলো। অসুখের মতন এটাও ছোঁয়াচে কিনা। বোলে তার সেই হাসিকান্নার হাসি হাসতে লাগলো। আমি চেপে ধোরলুম। বোললুম, না ভাই আজ আর ছাড় নেই। তোমাদের মধ্যে একটা কিছু হোয়েছে নিশ্চয়ই। বোলতেই হবে আজকে। তখন নিরুপায় হয়ে কাঁটা তার দুঃখের জীবনের কথা বোলতে লাগলো। কি সে দুঃখু ভাই আমি নিজের কথাই পাঁচ কাহন করছি, কিন্তু ওর তুলনায় আমি তো সগ্‌গে আছি। জোর কোরে বলালুম বটে, কিন্তু শুনে এতই কষ্ট হোলো। মনে হোলো, না শুনে ছিলুম ভালো।

সৈ পুরুষকে তুমি ভাই ভালো বলো। অমন ভালো অতিবড় শত্তুরের হোয়ে কায নেই। ও গরিব বেচারি ছেলেবেলা মা হারিয়ে মামার বাড়ি পড়ে ছিলো। আর কিছু না হোক মাতাল বাপ আর ডাকনি সৎমার হাত থেকে তো বেঁচেছিলো। সন্ধান নিয়ে নিয়ে দরদ দেখিয়ে এখানে আনানো হোলো কেন আর কেনই বা মিছে আশা

দিয়ে ওর এত দুগগতি করা হোলো, তুমিই বিচার কর সৈ। ও কি পায়ে ধোরে বোলতে গিয়েছিলো ওগো আমার আপন বোলতে কেউ নেই। আমায় পায়ে রাখ। তা তো নয়। তোমারই ঘাড়ে ভূত চাপলো, কত নভেলিয়ানা কোরলে চিটি লিখলে উপহার দিলে এমন কি বিয়ের সমস্তো কথা পজ্জন্ত ঠিক হোলো। তারপর অকসসাৎ সব উলটে দিলে। তোমার মনের মধ্যে কি হোলো তুমিই জানো বাইরে দেখালে আমায় দেখে বড় পচন্দো হয়েছে। আমায় না হোলে আর চলবে না। এই হোলো বিচার। ধিক তোমার কলেজে পাস করা আর ধিক তোমার পুরুষত্ত। সৈ পাস করানো যদি আমার হাতে থাকতো তো এমন সব লোককে পেরথোম ভাগের গণ্ডি পেরুতে দিতুম না। সত্যিই ভাই আমার বড্ডই কষ্ট হয়েছিলো। সেদিন গল্প বলতে বলতে কাঁটা এক এক বার তার সেই হাসি হাসে আর আমার বুকের পাঁজরাগুনো যেন খোসে যায়। মনে হয় এই যে আমায় ওর এত আদর অভ্যত্তনা এ যেন সবই ভুয়ো। একদিন এও শেষ হোয়ে যেতে পারে। কাঁটা উঠে যাবার সময় আমার গলা জড়িয়ে বোললে, এসব কথা একটিও বরের কানে তুলো না যেন। পুরুষমানষের মন কোন দিক দিয়ে ভাঙে বলা যায় না, আর বোলেও তো আমার কোন উবগার কোরতে পারবে না। বিধির নেকোন। আমার পোড়া কপাল পুড়িয়েছেন, তুমি আর কি কোরবে বোন। আমার কিন্তু সৈ রাগে শরীর গিসগিস কোরছিলো। মনে মনে ঠিক কোরলুম এ অন্যায়ের একটা বিহিত কোরবই তবে আমার নাম শৈলদাসী।

রাত্তিরে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলুম। ও তাসের আড্ডা থেকে রাত করেই আসে। সে রাত্তিরে এসে পেরথোম আস্তে আস্তে ঠেলতে লাগলো তার পরে জোরে নাড়া দিতে লাগলো। কিন্তু শম্মা

জেগে ঘুমুচ্চে তুলবেন কাকে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে বোধ হয় বুঝতে পারলে যে এ সোজা ঘুম নয়। তখন খোসামোদ সুরু করে দিলে। ছি ছি সে খোসামোদ দেখলে বোধ হয় নেহাত যে বেহায়া তারও লজ্জা হোতো সৈ। আমার তো লজ্জাও হোলো কষ্টও হোলো আবার রাগও হোলো। তখন ঘুম ভাঙার ভান করে পাশ ফিরলুম। ভাবলুম একটা কপট ধমক দি, কিন্তু কইতে লজ্জা করে, পোড়া মুখে হাসি এসে গেলো। ভাই সৈ আমার এই হাসিটা হয়েছে কাল। সময় নেই অসময় নেই বেরিয়েই আছে। লোকে সুখের সময়ই হাসে কিন্তু রাগে যখন গা রি রি করছে সে সময়ও যে কোথা থেকে আমার এ পোড়া হাসি উদয় হয় তা জানি নে। গম্ভির হতে গিয়ে ওর কাছে একেবারে খেলো হয়ে গেলুম। তখন ওও পেয়ে বোসলো আর আমায়ও সব কথা বলতে হোলো। আমার গপ্প শেষ হয়ে গেলে ও অনেকক্ষণ একভাবে চুপ করে পড়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বাকসো থেকে একটা চিটি নিয়ে এসে আমার হাতে দিলে। আলোটা উস্কে দিয়ে বললে পড়। বলে বাইরে চলে গেল। এক নিস্শেসে আমি সমস্তটা পড়ে গেলুম। পড়তে পড়তে আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উটল। সে সব কথা আর তোমায় কি লিকবো ভাই। বুঝতে পারলুম ওর কোন দোষ নেই। কাঁটার সৎমা মিছে কলংক দিয়ে কাঁটার চিরজন্মটা নষ্টো করে দিয়েছে। না হোলে আমি আজ যে যায়গা জুড়ে বসেছি সেখানে কাঁটাই রানি হোয়ে থাকতো। একটা ছোট চিটিতে বেচারার সুখের নেশা ভেঙে দিয়েছে রাকুসি। এখন একবারটি চোখের দেখা দেখবার জন্যে যেন কি কোরতে থাকে। আর একবারটি দেখতে পেলে যেন হাতে সগগ পায়। আমার যেন মনে হোতে লাগলো ওরই ধন আমি

কেড়ে নিয়ে আছি। যেন সত্যিই ওর স্থখের পথে কাঁটা হোয়ে আছি। মনে মনে বোললুম, হে বিধাতা পুরুষ, ত্রিসংসারে তোমার এমন কি কোন বিধান নেই যাতে কোরে ওর জিনিষ ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি।

এই সব ভাবচি এমন সময় ও ফিরে এলো। ওমা দেখি কেঁদে চোখ দুটো এরই মোধ্যে রক্তজবা কোরে তুলেচে। আমি তো দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এত কড়া এরা আবার এত নরম। বুকে ধক কোরে একটা চোট লাগল। সে মুখ যদি দেখতিস সৈ। কিন্তু তক্ষুনি মনকে কড়া করলুম—না পুরুষমানুষের ওপর এত দুর্ব্বল হোলে চলে না তো। আমি ওকে দেখিয়েই হাতের চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম আর জ়িগ্যেস কোরলুম, অমন মানুষের নামে এই সব বিশ্বেস কর। দেখি ওর চোখ দুটো আবার জলে ডব ডব কোরে উটল। আমার গলাটা জড়িয়ে বোললে, দেখ আমি বিশ্বেস করি নি বড় একটা। তবে ভয় হোলো যদি ওকে বিয়ে করি তো এ রাক্কুসি এই সব কলংক রটাতে ছাড়বে না। সত্যি বলতে কি পেরথোম পেরথোম চিটিটা পেয়ে আমি যে কি কোরব কিছুই ঠিক কোরে উটতে পারি নি। এক দিকে ওর ভালবাসা আর এক দিকে এই অগাদ কলংকের ভয়। এই দোটানায় পড়ে আমি হাবুডুবু খাচ্চি এমন সময় একদিন তোমায় দেখলুম। শুনছি তোমাদের মোধ্যে পথের কাঁটা না কি একটা পাতানো হোয়েচে। তা ঠিকই হোয়েচে কেন না তোমায় যদি না দেখতুম তো শেষ পজ্জন্তো ওই ছোট চিটিটার ভয় থাকতো কিনা বলা যায় না।

সৈ হোন সোয়ামি কিন্তু এ কথাগুনো আমার তেমন ভালো লাগলো না। খুব মুখ ভার কোরে বোললুম, তা পথের কাঁটা সরতে আর কত দেরি হয়। বেশ বুঝতে পারলুম কথাটা শুনে ও মনে মনে চমকে উটলো। আমায় বুকের মোধ্যে চেপে ধোরে বোললে, ছিঃ ও কথা বলে

না। যা হবার হোয়ে গেচে। আর তো ফিরবে না। আমি মনে মনে বোললুম, একবার দেখবো ফেরে কিনা। সে এখন তোমায় বলি সেই থেকে আমার মনে পাপ ঢুকলো। ভাবলুম যাকে এত ভালবেসেছি তার জন্যে যদি তুচ্ছ জীবনটা য়ায়ই তো খেতি কি। আমি তো সরি। তারপর পুরুষের মন উনি নিশ্চয় কাঁটাকে তুলে নেবেনখন। দুদিন পরে আমার কাঁটা ওর ফুল হোয়ে উঠবেখন। ভাবলুম যা হোক আমার নারীজন্ম তো সাথ্যক হোয়েচে। এখন আমার এ দেবতার কোলে ও অভাগিনীকে তুলে দিয়ে ওর নারীজন্মটা সাথ্যক কোরে দি। যা কোরতে যাচ্ছি তাতে অশেষ পাপ বটে। কিন্তু যিনি এত সব দেখছেন বুঝছেন সেই অন্তোজ্জামি আমার এ তুচ্ছ অন্তরের ব্যথা কি বুঝবেন না? অনেকক্ষণ এই রকম ভেবে মনটাকে মুক্ত কোরে ওর বুকের মোদ্ধে থেকে মুখটা বার কোরে নিলুম। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে বুকটা গুমরে উটতে লাগলো। মনে হোতে লাগলো এ অমূল্য রত্ন আর বেশি দিন দেখতে পাবো না তো। তাই এসব কথা ভুলিয়ে সমস্ত রাত ধোরে ওকে কত গল্প বলালুম। যত চুমো চাইলে যেন শেষ দেওয়ার মতন দিলুম। বেহায়ার মতন আমিও গোটা কতক চেয়ে নিলুম। তার পর শেষ রাত্তিরে যখন ঘুমিয়ে পড়ল জন্মের শোধ পা দুটো জড়িয়ে পড়ে রইলুম। মনে মনে বোললুম দেবতা আমার তুমি। মেয়েমানুষ ধম্মের জন্যে পরের জন্যে চিরকাল আত্ত-জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে, তাই আমিও চোললুম। অপরাধ নিও না।

ওর বোধ হয় সন্দেহ হোয়েছিলো। পরের দিন আমায় চোখে চোখে রাখতে লাগলো। আমার দুঃখুও হোলো আবার হাসিও পেলে। দুকুর বেলা যখন সবাই শুয়েছে আমি বিছানায় শুয়ে রোইলুম আর ঝি এলে বোললুম, ঝি কপালটা ধোরেছে একটু আপিন কিনে এনে দিতে পারিস?

পোড়ারমুখি বোললে কি, কিনতে হবে কেন? মা খান তো চেয়ে এনে দিগে। আমি ব্যস্ত হয়ে বোললুম, না না, নতুন মানুষ আমি সামান্য মাথা ব্যথা নিয়ে একটা হৈ চৈ হবে। তার চেয়ে তুই চুপি চুপি বাজার থেকে এনে দে বাছা। এই নোটটা নে। আমায় টাকা খানেক এনে দিয়ে বাকীটা তুই রেখে দিস। বুড়ো মানুষ এতটা পথ যাবি। টাকার লোভ বড় লোভ ঝি চোলে গেল। সমস্ত ঘরটার দিকে চেয়ে যেন আমার কান্না আসতে লাগলো। এ সগগো ছেড়ে যাওয়া কি শক্তো সৈ। এক একটা জিনিষ বুকের এক একটা পাঁজরা যেন টেনে ধোরেছে। যে শশুরবাড়ি অজগরের মত হাঁ কোরে ছিল সেটা এইটুকুতে মার মত কোলে জড়িয়ে ধোরে রইল। মনে হতে লাগলো সুখে হোগ দুঃখে হোগ নারীজন্মের এই বৈকুণ্ঠ। ননদটা থেকে আরও যারা যারা যন্তোনা দিয়েছে সবাইয়ের জন্যে প্রাণটা আইঢাই কোরতে লাগলো। মনে হোলো তারা যেন কত জন্মের আপনার লোক। যেন তাদের যন্তোনা দেওয়াটাই কত সুখের কত গরবের জিনিষ। এত আপনার যারা তাদের ছেড়ে থাকা কি সম্ভব। মনে মনে বোললুম, ভগবান এ বেরতো উজ্জোপোন কোরতে তুমিই আমায় খেমতা দাও প্রভু।

বিকেল বেলা শেষ বার ঝেড়ে ঝুড়ে ঘরটাকে পরিস্কার কোরছিলুম। পালংএর কাছে যেতেই কালকের চিটিটার কথা মনে পোড়ে গেল। রাগের মাথায় সেই যে ফেলে দিয়েছিলুম আর তুলি নি তো। তবে গেল কোথায়? ঠিক পাগলের মতন হোয়ে গেলুম আমি। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন কোরে খুঁজতে লাগলুম। কোথাও সে চিঠি নেই। কে নিলে সে চিটি। যত ঠাকুর আছেন সবার পায়ে মাথামুড় খুঁড়তে লাগলুম। কত মানত কোরলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। আমার মনে যে তখন কি হোচ্ছিল কি বোলব সৈ। হাত পা ভয়ে যেন পেটের

মোন্তে সেঁদিয়ে যেতে লাগলো। শেষকালে আর দাঁড়াতে পারলুম না। যেন কত দিনের রুগির মতন অবশ হয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পোড়লুম। এমন সময় আমার সেই ছোট দেওরটি ঘরে এসে হাসতে হাসতে বোললে, বউদি বেশ মজা হয়েছে। তোমার একটা চিটি ছোড়দি গিয়ে ওপাড়ার অন্নদিকে দিয়ে এসেছে। আজ খুব মজা হবে। আমি তো ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম। মুখে আর রা সরছিল না, শুধু জিগ্যেস কোরলুম, তুমি দেখেছ দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছে বইকি। ছোড়দি ভারি মজার লোক। খোকা হাততালি দিতে দিতে চোলে গেল। আমি কি যে হোয়ে গেলুম বোলতে পারি না। প্রকাণ্ড বাড়িটাতে পিঞ্জরাবধ্যো পক্ষির মতন ছটফট কোরতে লাগলুম।

তারপর যে কি হোয়েছিলো মনে পড়ে না। ঝি বলে আমি অগ্যান হোয়ে গিয়েছিলুম। যা হোক সন্দের সময় দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আর দিদিশাশুড়ি আস্তে আস্তে আমার রগ দুটো টিপে দিচ্চেন। এক ঘর লোক। অনেকক্ষণ পরে এক এক করে সবাই যখন যে যার কাযে গেল আমি ঝিকে একলা পেয়ে জিগ্যেস কোরলুম, আপিন কৈ? ঝি বোললে, আনছিলুম। মিত্তিরদের বাড়ি হোয়ে আসতে ওদের অন্নু বসিয়ে তোমার কথা জিগ্যেস কোরলে তারপর বোললে আমায় দে। শুধু আপিনে হয় না, আমি ভাল ওসুদ ওর জানি। তোয়ের কোরে নিয়ে আসছি। তাই আমি দিয়ে এসেছি। কিন্তু কৈ এখনও তো এলো না। বোধ হয় অনেক জিনিষ যোগাতে হবে। আমার গা সৈ ঝিম ঝিম কোরে এলো। ওই কলংকের চিঠি পাবার পর আপিন দিয়ে দুখিনি যে কার ওসুদ তোয়ের কোরেচে তা আর আমার বুঝতে বাকি রইল না। ঝি বলে আমি আবার অগ্যান হয়ে পড়েছিলুম। সৈ ভাই সমস্ত রাত যে কি কোরে কাটল তা অন্তোর্জামি বই আর কেউ জানে

না। সকালে যা ভেবেছিলুম সেই খবরটাই সমস্ত পাড়াটায় রাষ্টো হোয়ে গেল। সে আমারই অস্তোর কেড়ে নিয়ে বড় প্রবোঞ্চনা কোরে আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল। আজ ৫ দিন হোয়ে গেছে। পাষাণি আমি খাচ্চি দাচ্চি বেশ ভালই আছি। আর কাঁদিও না অগ্যানও হোয়ে পড়ি না। পথের কাঁটা আমার পথ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সোয়ামি যখন আদর কোরে জড়িয়ে ধরে বুকে কোথায় একটা কাঁটা যেন খচ খচ কোরতে থাকে। কেবলই মনে হয় এ যেন কার জিনিষ কেড়ে নিয়েছি।

তুমি আমার ভালবাসা জেনো।

ইতি—

তোমার অভাগিনি

সৈ

মেঘদূত

১

এ কাহিনীটি বোধ হয় নিতান্তই কবিকল্পনা, সংজ্ঞা দেখিয়া গোড়াতেই এইরূপ একটা ভুল ধারণা আসিয়া পড়িতে পারে; তাই বলিয়া রাখি, এর যক্ষরাজ—এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীমান অভয়পদ, যক্ষবধূ—শ্রীমতী অনিমা রায়, এবং এর মেঘদূত— যাক, আপাতত তিনি একটু অন্তরালেই থাকুন।

অভয়পদর বৈমাত্র ভাই শ্যামাপদর বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ তিনি তাহার চেয়ে ন্যূনকল্পে বাইশ-তেইশ বৎসরের বড়। বড্ড রাশভারী পুরুষ। পিতা অবশ্য আরও ঢের বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বড় ঢিলাঢালা, অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ মানুষটি। তাঁহার বর্তমানে দাদার কড়া শাসনটাকে একটু পাশ কাটাইয়া আসিতে হইত বলিয়া অনেকটা বাঁচোয়া ছিল, মানে, তবু কিছু স্বাধীনতা পাওয়া যাইত; এখন তাঁহার মৃত্যুতে সেটুকুও লোপ পাইতে বসিয়াছে।

শ্যামাপদ বলেন, সংসারটা পরীক্ষাগার, হাসিঠাট্টার জায়গা নয়। তাই সবার হাসিঠাট্টার পথে কড়া চোখের পাহারা বসাইয়া তিনি নিজের অধীনের জীবগুলিকে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে গম্ভীরভাবে মোতায়েন হইয়া গেছেন। মন লইয়াই আসল কথা; কিন্তু বিপদ এই যে, মনের গূঢ় তত্ত্বগুলি খোদ মানুষের নিকট হইতে সব সময় ভাল করিয়া আদায় করা যায় না। তাহার কারণ, হয় মানুষকে সব সময় ইচ্ছানুরূপ অবস্থায় ফেলা যায় না, না হয় ফেলিতে পারিলেও আত্মগোপনশীল মানুষের চতুরালি ছিন্ন করিয়া তত্ত্বরত্নগুলি উদ্ধার করাও সময় সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্য শ্যামাপদ বাড়ির

একধারে নিরিবিলি দেখিয়া একটি ল্যাবরেটরি অর্থাৎ বীক্ষণাগার তৈয়ারি করিয়াছেন। সেখানে ব্যাং, টিকটিকি, গিনিপিগ, খরগোশ, বিলাতী ইঁদুর প্রভৃতি যেসব প্রাণীর সঙ্গে মানুষের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাদের খাঁচাবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজনীয় অবস্থায় ফেলিয়া এবং প্রয়োজন গুরুতর হইলে চিরিয়া-ফাড়িয়াও শ্যামাপদ মানব-মনের তত্ত্বরাশি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সেগুলি যথাবিধি নোট-বুকে জমা হইয়া উঠে, তাহার পর মানুষের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাদের যাচাই হয়। শ্যামাপদর বেশির ভাগ সময়ই এই বীক্ষণাগারে কাটে।

পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্যামাপদ নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। কেমন যেন একটা মনমরা ভাব, কিছুতে স্পৃহা নাই, পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে এবং অত্যন্ত বাধ্য ও সত্যবাদী হইয়া পড়িয়াছে। মনস্তত্ত্বের অনেক পুস্তক উলটাইয়া এ অবস্থার একটা নামও বাহির হইল—loss of individuality অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বিলোপ। জ্যেষ্ঠ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। একটা গিনিপিগের খাঁচা হইতে ধাড়ী দুইটাকে সরাইয়া দেখা গেল, ছানাগুলার তাহাতে মোটেই কোন দুঃখ নাই, বরং খাদ্যের দুইটা বড় বড় অংশীদার স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং খাঁচার মধ্যেও চলাফেরা করার খানিকটা সুবিধা হওয়ায় তাহাদের ব্যক্তিত্ব বেশ বাড়িয়া গেল বলিয়াই বোধ হইল। মাথা ঘামাইয়া আরও যেসব গবেষণা করা গেল, তাহাতেও এই ধরনের উলটা ফলই হইতে লাগিল। তখন খাঁচাবন্দীদের নিকট হতাশ হইয়া শ্যামাপদ গৃহবন্দিনীর দ্বারস্থ হইলেন। স্ত্রী হৈমবতী বিনা চিন্তা এবং গবেষণাতেই বলিলেন, ঠাকুরের কালাশৌচটা গেলে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

শ্যামাপদ হাঁ করিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রী বলিলেন, ও রকম ক'রে চেয়ে রইলে যে? তুমি তো এই চাও যে, ঠাকুরপো একটু অন্যমনস্ক হোক, মনে একটু ফুর্তি আসুক?

শ্যামাপদ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করিলেন। তারপর একটা শোফার হাতলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, কিন্তু বিয়ে হ'লে ভাবনা বাড়ারই কথা তো! অবশ্য ঠিক কি হয়, তা মনে পড়ছে না।

স্ত্রী বলিলেন, আচ্ছা তো! না মনে পড়লে আমার ভাবনার কথা যে! °তা অত বেশি আর তোমায় এগুতে হবে না, আমিই কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছি, বারো সের ওজনে বেড়ে গিয়েছিলে, আমায় নিয়ে আসবার সময় ইষ্টিশানে তৌল হয়ে এসে আমায় জানালে।—মনে পড়ছে?

শ্যামাপদ বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তুমি বললে, থাক্, ইষ্টিশানের লোকদের ওজন বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে কাজ নেই। আমায় তখন পাটের গাঁটরি কি চালের বোরা ভেবেছিলে, কে জানে!

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ভুল হয়েছিল, চালের বোরার মধ্যে তবুও একটা বস্তু থাকে। তারপরে নৈহাটি ইষ্টিশানে দিলদরিয়া হয়ে সেই বুড়ী ভিকিরীটাকে গলার মাফলারটা খুলে দিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করতে বললে—

শ্যামাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে—

ফুর্তির চোটে চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা মুচকে—

শ্যামাপদ লজ্জিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। অভয়পদর বিবাহ দেওয়াই সিদ্ধান্ত হইল।

২

অভয়পদ যেদিন বধূ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, সেইদিন বিকালে শ্যামাপদ টেরিটিবাজার হইতে এক জোড়া হাড়গিলা কিনিয়া আনিয়া নিজের ল্যাবরেটরি-সাৎ করিলেন। হৈমবতী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, এ আবার কি শখ! কি হবে এ দুটো? চেরা-ফাড়া করবে তারও তো মাংস দেখচি না এদের গায়ে!

শ্যামাপদ একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, চখাচখীই কেনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তাই প্রায় একই জাত ব'লে এই দুটো—

হৈমবতী আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, চখাচখীই বা কি হ'ত?

ওই কি যে বলে, ওদের দাম্পত্য-জীবনটা আদর্শ :কিনা, এ কথা আমি একাই বলছি না গো, তোমাদের কালিদাসও স্বীকার ক'রে গেছেন, চক্রবাক-চক্রবাকী।

করুন। তারপর?

তাই মনে করলাম, অভয়টার বিয়ে হ'ল, এখন কি ভাবে চললে ওদের দাম্পত্য-জীবনটা আদর্শ হয়ে ওঠে, একে অন্যের জীবনটাকে ভালভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে, সে সম্বন্ধে একটু গবেষণা করা দরকার, তাই—

হৈমবতী গালে তর্জনী স্পর্শ করিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, তাই বাজার থেকে এক জোড়া হাড়গিলে কিনে নিয়ে এলে! অবাক করলে তুমি! অমন সোনার চাঁদ ভাই-ভাদ্দরবউ ওই ল্যাংপ্যাঙে হাড়গিলের সামিল হ'ল! ষাট ষাট। ম্যাগো, একটা আস্ত ব্যাং গিলে ফেললে! দূর হ।

শ্যামাপদ বিপর্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি অবুঝ দেখ তো! আরে, ওদের সামিল হবে কেন? কথা হচ্ছে, মনটা উভয় ক্ষেত্রে একই ভাবে কাজ করে, পালক রোঁয়া এসবের মধ্যেই হোক, আর শেমিজ-কামিজের মধ্যেই হোক। যেমন ধর, বুধী গরুটাকে দুইবার সময় সে তার বাছুরটার জন্যে খানিকটা দুধ চুরি ক'রে রাখে, সেটা যে কারণে হয়, ঠিক সেই কারণেই তুমিও খাবার পর খুকীর জন্যে তোমার ভাগ থেকে খানিকটা—

হৈমবতী ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, থাম বাপু। শখ থাকে তোমার ভাইকে হাড়গিলে কর গিয়ে, আমায় বুধীর সঙ্গে তুলনা দিতে হবে না।

বিবাহের পর প্রত্যাশিত ভাবান্তরটুকু বেশ পাওয়া গেল। অভয়পদর মনের প্রফুল্লতা সুদে আসলে ফিরিয়া আসিয়াছে, ওজনও বাড়িয়াছে ভাল রকমই; কিন্তু পাঠ্যজীবনের উপর প্রতিক্রিয়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং সত্যবাদী ভাই যে সেটা গোপন করিবার জন্য ধীরে ধীরে উৎকট মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাড়গিলাকে এঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে হয় না বলিয়া তাহার নিকট হইতে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হইয়া উঠিতে লাগিল। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে হাতুড়ি-পেটার কল্যাণে অভপদর এতদিন মাথাব্যথা কিংবা পেট-কামড়ানির কোন বালাই ছিল না, এখন ক্রমে ক্রমে এই রোগ দুইটির আবির্ভাব হইতে লাগিল। শ্যামাপদ রোগের জন্য মোটেই চিন্তিত হইলেন না; দুশ্চিন্তার কারণ এই যে, কোন রকম ঔষধপত্র সেবন না করিয়া শুধু নববধূর সেবার অর্থাৎ উপস্থিতির গুণেই আরোগ্য-লাভ হইয়া যায়। ওদিকে তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় হইয়া আসিতেছে, এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এ একটা সঙ্কট। শ্যামাপদ মহা ফাঁপরে পড়িলেন, এবং অবশেষে একদিন নেহাত অনন্যোপায় হইয়া

কনিষ্ঠকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও কথাটা কি ভাবে পাড়িবেন, সে বিষয়ে মনে মনে একটা খসড়া তৈয়ারি করিতে লাগিলেন।

অভয়পদ প্রবেশ করিলে শ্যামাপদ বলিলেন, তেমন কিছু কথা নয়, ওদিকে কয়েকটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম ব'লে তোমার পড়াশুনার কথাটা অনেকদিন একেবারেই ভাবতে পারি নি। হ্যাঁ, কেমন প্রিপ্যারেশন হচ্ছে ?

অভয়পদ হাতের আংটিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে বলিল, ভালই।

থার্ড ইয়ারের পরীক্ষাটা আবার এসে পড়েছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল।

এই পরীক্ষাটা বড় শক্ত কিনা, এটা পেরিয়ে গেলেই আবার দু বচ্ছর নিশ্চিন্দি।

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল। দাদাও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, ইয়ে, কথা হচ্ছে, কোন রকম ডিস্‌টার্‌বেন্স হচ্ছে না তো ?

অভয়পদ বলিল, আজ্ঞে না, ঘরটা বেশ নিরিবিলি থাকে।

শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন, সেই তো সর্বনাশের মূল। একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, ওইটিই এখন দরকার। মানে হচ্ছে, যদি এ সত্ত্বেও মনে কর যে, এক-আধজনকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে বাড়িটা আরও হালকা, আরও নিরিবিলি করা দরকার তো সে ব্যবস্থাও না হয় করা যায়।

কথাটা জলের মত সহজ; কিন্তু অভিলষিত ফল পাওয়া গেল না। অভয়পদ স্রেফ বুঝিতেই পারিল না কিংবা পারিয়াও বুঝিল না, বলা

শক্ত। যেন খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিল, আজ্ঞে না, পিসীমা পড়ার ঘরে এসে একটু গজর গজর করতেন, তা তিনি তো চ'লেই গেছেন কাশী।

শ্যামাপদ উত্যক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাঁচিয়েছেন তোমাদের দুজনকে। প্রকাশ্যত এ প্রসঙ্গটা আর চালাইতে পারিলেন না। ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা যেন হ'ল, কিন্তু তোমার শরীরটার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। তোমার বউদি বলছিলেন, আজকাল নাকি প্রায় মাথাব্যথা করছে? ওটা ঠিক নয় তো।

অভয়পদ এ আক্রমণে একটু থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু সরল-অন্তঃকরণ দাদা নিশ্চয় দাম্পত্য-শাস্ত্রের প্যাঁচোয়া কথা অতশত বুঝেন না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া সহজভাবেই বলিল, হ্যাঁ, ওদিকে পড়াশোনার একটু চাপ পড়েছিল, তাই দু-এক দিন রাত জেগে—

শ্যামাপদ অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া কহিলেন, ওইটি তোমাদের বড় অন্যায়। রাত জেগে পড়াশোনা করাটা—। তারপর দৃষ্টি নত করিয়া কহিলেন, তোমার গিয়ে, যে কোন কারণেই হোক, রাত জাগাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর। আচ্ছা, যাও তা হ'লে। এই সব জিজ্ঞাসা করবার জন্যেই ডেকেছিলাম। না, রাত-টাত জাগার আর ধার দিয়েও যেও না।

৩

ভাইকে সোজাভাবে বাগ মানানো গেল না। দাদা কোন বক্ররীতি অবলম্বন করিলেন কি না বলা যায় না, তবে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, হাড়গিলা দুইটা পৃথক পৃথক পিঁজরায় বন্দী হইয়া অত্যন্ত চেঁচামেচি লাগাইয়াছে, এবং আশ্চর্য যোগাযোগ—ইহার প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই অভয়পদর খুড়শ্বশুর আসিয়া বলিলেন, তাঁহার দাদার শরীর খারাপ, দিন-কতকের জন্য কন্যাকে দেখিতে চান।

হৈমবতীর আপত্তি সত্ত্বেও শ্যামাপদ ভ্রাতৃবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

দিন পনরো সতর্ক পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গেল, এই বিচ্ছেদের ফলে শুধু গভর্মেণ্টের ডাকবিভাগ দুই হাতে পয়সা লুটিতেছে মাত্র। রোজ একখানি করিয়া ব্যাটরা পোস্ট-আপিসের ছাপ মারা স্ফীতোদর লেফাফা শ্রীমান অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের নামে হাজির হয়, একখানি টিকিটে প্রায়ই তাহার ভাড়া কুলায় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সেসব পত্রের আধা-আধি ওজনেরও জবাব প্রত্যহ ব্যাটরা অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে পাটীগণিতের সোজা হিসাবে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভাইয়ের কলেজ বা পরীক্ষা—এসব দিকে মন দিবার আর একটুও অবসর থাকে না। আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছে, এতদিন অভয়পদর মাথাব্যথা পেট-কামড়ানি ছিল, এখন—কি বিধানে বলা যায় না—সে উপদ্রব বধূর শরীরে গিয়া জুটিয়াছে। তিন দিন তো এমন অবস্থা গিয়াছে, কলেজে গাড়ি পাঠাইয়া অভয়পদকে বধূর শয্যাপার্শ্বে হাজির করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, উগ্রতাটা বেশিক্ষণ থাকে না, তবে দাদার তরফ হইতে চিন্তার বিষয় এই যে, স্বয়ং ভাইকে এ অবস্থায় সমস্ত দিনরাত ব্যাটরায় থাকিয়া যাইতে হয়।

এর উপর যেদিন সকালে দেখা গেল যে হাড়গিলা-দম্পতি পিঁজরার বাহিরে গলা বাড়াইয়া অর্ধমৃত অবস্থায় নীরবে পড়িয়া আছে, সেদিন শ্যামাপদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈকালেই গিয়া ভ্রাতৃবধূকে গৃহে লইয়া আসিলেন, এবং পুকুরঘাটে নির্জনে বসিয়া ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দারুণ সমস্যা, কাছে থাকিলেও বিপদ ; দূরে থাকিলে বিপদের উপর বিপদ। ওদিকে পরীক্ষার মাত্র আর তিন সপ্তাহ বাকি। অন্তত বধূটি যদি একটু বুঝিত, তবু একটা সুরাহা হইতে পারিত। বুদ্ধি আছে, তবে সঙ্গদোষে সেটা এখন ষোলো আনাই অকাজে লাগিতেছে। মুশকিল এই যে, কিছু বলিতে যাওয়াও সম্বন্ধবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তবুও কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং সে ভবিষ্যতের সহিত ভ্রাতৃবধূর ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া, শ্যামাপদ আর অত অগ্রপশ্চাৎ ভাবিলেন না, দিন দুই পরে একবার ভ্রাতৃবধূকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল।

আজকাল কেমন আছ মা ?

ভাল আছি।

শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন, তা জানি।

হ্যাঁ, ব্যাটরাতে বড় সংসারে ছেলেপিলের গোলমাল বেশি, তাই আমি ভাবলাম, শরীরটা যখন এত উপরি উপরি খারাপ হচ্ছে, একটু নিরিবিলিতে থাকাই ভাল। এখানে কোন রকম গোলমাল হচ্ছে না তো ?

না।

হ'লেও তুমি এড়িয়ে চলবে, অভয়টার মতন তো আর নও। দেখ না, সামনে একজামিন, একটু চাড় নেই ; খেলা, কুকুর, এ ও তা—এই সব নিয়েই ব্যস্ত।

বধূ একটু মাথা নীচু করিল, বোধ হয় অনিশ্চিত এ-ও-তার মধ্যে নির্দিষ্ট কাহাকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

শ্যামাপদ বলিলেন, একজামিনের আর মোটে তিন সপ্তাহ কিনা। একটু থামিয়া বলিলেন, আর তিন সপ্তাহই বা কোথায় ? এদিকে এই

এগারোটা দিন, ওদিকে সাতটা দিন, এই আঠারোটি দিন কুল্লে আছে। তার মধ্যে আগে শেষে দুটো দিন তো বাদই দিতে হয়, নয় কি?

হুঁ।

আর কিছু নয়, এটা ওর থার্ড ইয়ার কিনা, তাই একটু সাবধান হওয়া। তা তুমি আমি সাবধান হ'লে কি হবে মা! ওটার কি আর নিজের চাড় আছে? দেখতে পাও কি?

বধূ মুখ নীচু করিয়া ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িল, না, কোন চাড় দেখিতে পায় না।

বিষয়টির গুরুত্ব ভাল করিয়া মাথায় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া শ্যামাপদ বলিলেন, তা হ'লে যাও মা তুমি, শরীরটা কেমন আছে তাই জিজ্ঞেস করতে ডেকেছিলাম। অনুকূল ডাক্তার বললে, এখন স্রেফ বিশ্রাম আর ঘুম, ঘুমটা একটা মস্তবড় দরকারী জিনিস কিনা। যাও মা।

তিন-চার দিনের পর শ্যামাপদ খবর লইয়া দেখিলেন, ঘুমটা যে অত দরকারী জিনিস, তাহা তাঁহারও জানা ছিল না। ভ্রাতৃবধূ সমস্ত দিনটাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া, অথবা সুযোগ পাইলে গভীর নিদ্রায়ই কাটাইতেছে। এদিকে বধূ আসার পর হইতেই অভয়পদ মারাত্মক রকম নিরিবিলির ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া অমন একমনে পাঠাভ্যাস যে তাহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, এ কথা পূর্বে কেহ জানিত না। এ রকম নিষ্ঠা, শান্তি, নীরবতা দেখা যায় এক শুধু যোগাভ্যাস অথবা নিদ্রায়।

শ্যামাপদ স্ত্রী হৈমবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁগা, এ তো বড় ফ্যাসাদেই পড়া গেল এদের নিয়ে, সমস্ত রাত দুটোতে জেগে কাটাবে, আর সমস্ত দিন ঘুমুবে!

হৈমবতী মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, চুপ কর। তোমার কি ও রকম ক'রে বলা মানায়?

শ্যামাপদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি গেরো! মানায় না ব'লে চুপ ক'রে থাকতে হবে? বেশ, আমার না মানায় তো তুমিই না হয় বল না কেন?

ইস, আমি হন্তারক হতে গেলাম ব'লে! তা ছাড়া আমার লাগে ভাল।—বলিয়া, বোধ হয় একটু হাসিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেলেন।

ও!—বলিয়া শ্যামাপদ খানিকটা একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবটা এই—বুঝেছি, তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে।

এক নূতনতর বন্দোবস্ত করিয়া দেখা স্থির হইল। বাগানের মধ্যে বীক্ষণাগার হইতে খানিকটা দূরে, বাড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ছোট ঘর ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহাতে কাঠ-কুটা ভাঙা আসবাবপত্র রাখা হইত। সেই ঘরটি পরিষ্কার করাইয়া, কলি ফিরাইয়া অভয়পদর পড়িবার এবং শয়ন করিবার ঘর নির্দিষ্ট হইল।

শ্যামাপদ বলিলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম, তোমার বাড়ির ভেতর সব বিষয়ে অসুবিধে হচ্ছে, অথচ তুমি মুখ ফুটে বলতেও পারছ না। এ বাগানের মধ্যে একটেরেয় দিব্যি হ'ল, না?

অভয়পদ মুখটা গোঁজ করিয়া বলিল, হুঁ।

এখানে তোমাকে দোর জানলা কিছু বন্ধ করতে হবে না; বরং পড়তে পড়তে ক্লান্তি বোধ করলে বাগানে খানিকটা এদিক ওদিক বেড়িয়ে এলে। ফুল তুমি ভালও বাস, আর ওর চেয়ে মন প্রফুল্ল রাখবার মত কিই বা আছে?

অভয়পদ মুখটা আরও গোঁজ করিয়া, আরও অনুনাসিক স্বরে বলিল, হুঁ।

ভাই যেমন সর্বদা বইয়ে মুখে এক হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাতে মনে হয়, ব্যবস্থাটা খুব লাগসই হইয়াছে। হইবার কথাই কিনা, নীরব নিথর জায়গাটি যেন কণ্বমুনির আশ্রম। দাদা নিশ্চিন্ত হইয়া অনেক দিন পরে বীক্ষণাগারে একটু ভাল করিয়া মন দিতে পারিয়াছেন। হাড়গিলা দুইটারও অনুরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পরীক্ষায় পরীক্ষায় পরিশ্রান্ত হওয়ার দরুনই হউক, কিংবা অদর্শনের হেতু বিস্মৃতির জন্যই হউক, তাহারা আর ততটা গোলযোগ করে না। দিব্য খায়-দায়, যদি নেহাতই তেমন হইল তো হদ্দ তারের জালের উপর চঞ্চু দ্বারা গোটাকতক ঠোকর মারে। এসব যথারীতি নোট-বইয়ে লিপিবদ্ধ হইতেছে। শ্যামাপদ "Love That Defied Science" অর্থাৎ "যে প্রেম বিজ্ঞানকে মানে না" নাম দিয়া মনস্তত্ত্বমূলক একটি নিবন্ধ লিখিতেছেন, কোন বিলাতী কাগজে দিবেন। নূতন প্রেম বৈজ্ঞানিকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইল, তাহারই গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস। বিজ্ঞান-জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিবে বলিয়া আশা করেন।

৪

পড়িবার ঘর হইতে বাড়িটা দেখা যায়, কিন্তু বাড়ির কাহাকেও দেখা যায় না। সেইজন্য কেবলই মনে হয়, দুইটি টানা টানা ব্যাকুল চোখ এই দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, বই হইতে মুখ তুলিলেই যেন ক্ষণিকের জন্য চোখোচোখি হইবে।

ওদিকে টানা চোখ দুইটিও যেন সর্বদা একটু সজল, তাহারা যেন দেখিতে পায়, পাষাণের মত কঠিন বইয়ের পাতার উপর কোথাও একজন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে; তাহাকে উঠায়, একটু 'আহা' বলে, ত্রিসংসারে এমন কেহই নাই।

কল্পনাদেবী এইটুকু মধ্যস্থতা করেন।

আর একটু মধ্যস্থতা করে জিমি। তেতলার ঘরে বসিয়া অনিমা নীচের বিচিত্রতায় শূন্যতা দেখিতেছে কিংবা আকাশের মহাশূন্যতায় কত বিচিত্রতার ছবি আঁকিতেছে, সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিমি আসিয়া উপস্থিত হইল। অনিমা তাড়াতাড়ি সোফা কিংবা চেয়ার হইতে নামিয়া তাহার ঝিকঝিকে কোঁকড়া লোমে ভরা গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ পোড়ারমুখী ?

জিমি উত্তর দিতে পারে না বলিয়াই তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে অনিমার কোন দ্বিধা-সন্দেহ থাকে না; বলে, বুঝেছি তুই কার কাছে ছিলি, তোর চাইবার ভঙ্গীতেই বুঝেছি। কি করছে রে ? খুব পড়ছে, না? তুমি বলবে একজামিন, তুমি বলবে ঘুমটা দরকার; ছাই একজামিন, ছাই ঘুম, ওসব কিছু দরকার নেই ; তুই যা, বেরো।

একটু ধাক্কা দিয়া আবার কোমরটা সঙ্গে সঙ্গে জড়াইয়া ধরে, বলে, কি দেখলি লা ? খুব বুঝি পড়ছে ?

জিমি প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই সোহাগটুকু পাইয়া প্রবলবেগে ল্যাজ আর মাথাটা নাড়িতে থাকে। অনিমা উল্লসিত হইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরে, বলে, পড়ছে না, না? সে আমি জানি, আমায় ছেড়ে থাকলে ওর নাকি আবার পড়া হয়! যখন ফেল ক'রে বসবে, তখন বড়ঠাকুরের হুঁশ হবে।

জিমির সামনের পা দুইটা তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করে, কি বলিস ?

জিমি জিব বাহির করিয়া প্রবলবেগে মাথা দুলায়। অনিমা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে, না, তখনও হবে না? আচ্ছা যা, তোকে আর দৈবজ্ঞগিরি ফলাতে হবে না, কালামুখী কোথাকার।

অভয়পদর ঘরে গাদা-করা বই-খাতার সোঁদা গন্ধ হঠাৎ চাপা

পড়িয়া নববধূর জামা-কাপড়ের পরিচিত এসেন্সের বাসী গন্ধে ঘরটা ভরিয়া উঠে ; সে মুখ ফিরাইয়া চাপা উল্লাসের সহিত বলে, জিমি বুঝি ? কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

কোথায় এতক্ষণ যে ছিল, তাহা জানে বলিয়াই আর উত্তরের প্রয়োজন হয় না। আয় !—বলিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া কাছে টানিয়া লয়। বধূর মত অত আবোল-তাবোল বকে না, মুখের পানে আবেগময় দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কপালটিতে হাত বুলায়। ওর সমস্ত শরীরটাতে অনিমার স্পর্শ মাখানো আছে, অণু অণু করিয়া যেন সেটা মুছিয়া লইতে থাকে।

আবোল-তাবোল অত বেশি বকে না বটে, তবু এক-আধটা কথা বাহির হইয়াই পড়ে, প্রকৃতিস্থ লোকের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইতেই পারে না। বলে, কথা কইতে তুই শিখবি নি জিমি ? দুটো কথাও যদি আমার অনিমার কাছে পৌছে দিতে পারতিস !

একটু থামিয়া বলে, দেখ্ না, তোদের দেশে কুকুরেরা কত বড় বড় কাজ করছে ; কত খুনী আসামী ধরিয়ে দিচ্ছে, কত খবর পৌছে দিচ্ছে, কত—

এই ধরনের প্রাত্যহিক কথাবার্তার মধ্যে অভয়পদ একদিন একটু বেশিক্ষণ থামিয়া কি একটা ভাবিল, তাহার পর বইয়ের গাদা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, টেবিলের উপর একটা শক্ত নীল সুতার বাণ্ডিল ছিল, তাহার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহার মাঝখানে একটা কাগজের টুকরা বাঁধিল, তাহার পর সুতাটা জিমির বুকের চারিদিকে বেড় দিয়া বাঁধিল, সুতাটি ও তৎসংলগ্ন কাগজটি তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশির মধ্যে সন্তর্পণে ঢাকিয়া দিল।

দাদার ভাই প্রতি-গবেষণা লাগাইয়াছে।

কিন্তু হায়, সাফল্য-লক্ষ্মী নিতান্তই বিমুখ। পাঁজরার চারিদিকে হঠাৎ এ এক নূতন উপদ্রবে জিমি ঘোর আপত্তি লাগাইয়া দিল। উঠিয়া, পড়িয়া, গড়াইয়া এক মহামারি কাণ্ড বাধাইয়া দিল, এবং শেষে ছিঁড়িবার চেষ্টায় সুতাটায় সামনের একটা পা আটকাইয়া যাওয়ায়, তিন পায়ে সমস্ত ঘরটা ছুটাছুটি করিতে করিতে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

দাদা বুঝি আসিয়া পড়ে! সমস্ত ঘরটায় একটা ছুরি কি কাঁচি নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অভয়পদ জিমিকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, সুতাটা সাধ্যমত একটু টানিয়া ধরিয়া, দাঁত দিয়াই ছেদন করিয়া দিল। মুক্তির আনন্দে এবং কতকটা বোধ হয় প্রভুর এই হঠাৎ ভাবপরিবর্তনে অনেকটা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াও, জিমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

নিরাশ হইয়া অভয়পদ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; অটস্ফুস্বরে নিজেকেই বলিল, একটু ট্রেনিং দিতে পারলে ঠিক চিঠিটা পৌঁছে দিতে পারত, কেউ টেরও পেত না; কিন্তু যা হল্লা শুরু ক'রে দিলে! একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

কিন্তু হাজার হউক প্রেমিকের মন, তায় আবার বিরহশানিত একটি বিফলতাতেই তাহার উদ্ভাবনী-শক্তি লোপ পায় না।

এদিকে একটু সুরাহাও হইল।

সমস্ত দিন তক্কে তক্কে থাকিয়া খবর পাওয়া গেল, খরগোশের জোড়া ভাঙিয়া একটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, দাদা কাল সকালে টেরিটিবাজারে যাইবেন। অভয়পদ আন্দাজ করিল, অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগিবে। বেচারী খরগোশ! তা ভাল হইয়াছে; দাদার হাত হইতে তো পরিত্রাণ পাইয়াছে।

শ্যামাপদর মোটরের আওয়াজ যখন মিলাইয়া গেল, অভয়পদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। দুয়ারের কাছেই ছোট ভাইপোর সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রশ্ন করিল, দাদা কোথায় রে ধলু? তাঁকে আজ সকাল থেকে দেখছি না যে?

ধলু প্রত্যাশিত উত্তরই দিল, জানি না তো।

তবে তোর মা জানে নিশ্চয়, তাকেই জিজ্ঞেস ক'রে আসি। কোথায় আছে বল দিকিন তোর মা?

বড় ঘরে।

ভ্রাতৃজায়ার সন্ধানে অভয়পদ ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং যাহাতে তিনি সন্ধান না পান, সেই উদ্দেশ্যে বড় ঘরের দিকের রাস্তাটা বাদ দিয়া একেবারে অনিমার ঘরে প্রবেশ করিল। অনিমা ছিল।

কোয়ার্টার তিনেক পরে বিদায় লইয়া অলক্ষিতে বাহিরে আসিবে, হৈমবতীর একেবারে সামনা-সামনি পড়িয়া গেল। অভয়পদ বলিল, এই যে! দাদা কোথায় জিজ্ঞেস করব ব'লে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমায় সেই থেকে।

হাসির ভাব দেখিয়া থামিয়া গেল। এই সময় মোটরের পরিচিত হর্নের আওয়াজ হইল। ভ্রাতৃজায়া হাসিটাকে গাম্ভীর্যে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, ওঁকে খুঁজছিলে বললে; যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন! কি বলব?

অভয়পদ ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতেই ঘুরিয়া শাসন ও মিনতির ভঙ্গীতে বলিল, না, খবরদার তোমার পায়ে পড়ি বউদি—যাও—

দাদা আসিয়া দেখিলেন, ভাই পড়িবার ঘরে। একবার ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় একাগ্রতায় আর বাধা না দিয়া পা টিপিয়া ল্যাবরেটরির পানে চলিয়া গেলেন।

তিন কোয়ার্টার ব্যাপী কন্‌ফারেন্সে কিছু একটা সাব্যস্ত হইয়াছিল নিশ্চয়। সেদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় অভয়পদ বেশ একটি ডাগর দেখিয়া পিতলের ঘুঙুর কিনিয়া আনিয়া জিমির গলায় ব্যাণ্ডে ঝুলাইয়া দিল; তরল ঝুমঝুম আওয়াজে জিমি সমস্ত বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্যামাপদ অভিনবত্বটুকু অনুমোদন করিলেন, কহিলেন, মন্দ করে নি অভয়, ওদের মিউজিক্যাল সেন্সটা যদি ফুটিয়ে তোলা হয় তো মানসিক কোন পরিবর্তন হয় কি না পরখ ক'রে দেখবার বিষয়। অ্যানিম্যাল সাইকলজিতে আমরা একটা নতুন তথ্য দান করতে পারি।

নোট-বুকে তারিখটি টুকিয়া লইলেন এবং সূক্ষ্মভাবে সঙ্গীতকণ্ঠী জিমির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নোট-বইটি মন্তব্যে মন্তব্যে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৫

বেলা আন্দাজ নয়টা হইবে। ল্যাবরেটরিতে বিশেষ কোন কাজ নাই, তাহা ছাড়া ভাই এত সুবোধ হইয়া উঠিতেছে যে, তাহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্যও আর গবেষণার অছিলায় মিছামিছি বাগানে বসিয়া থাকিতে হয় না। শ্যামাপদ সাফল্যের জন্য বেশ একটি নিবিড় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন, এবং আপাতত উপরের বড় ঘরটিতে নিরালায় তাঁহার "Love That Defied Science" প্রবন্ধটির উপসংহার লেখায় ব্যাপৃত আছেন।

সামনের বারান্দা দিয়া জিমি নিতান্ত ব্যস্তসমস্তভাবে নীচের দিক হইতে আসিয়া ওদিকে অনিমার ঘরের পানে চলিয়া গেল। তাহার ভাবেই মনে হইল, সে বিশেষ একটা কাজে লাগিয়া রহিয়াছে, এদিক ওদিক চাহিবার ফুরসৎ নাই।

শ্যামাপদ কলমটা তুলিয়া লইয়া একটু অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সঙ্গীতে এই একাগ্রতাটুকু আনিয়া দিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সঙ্গীতে মানুষের মনে যে ঐকান্তিকতা জন্মায়, পশুর মনেও ঠিক সেই রকমই—

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ঘুঙুরের শব্দটা যেন ছিল না। তিনি কি রচনায় এতই লিপ্ত ছিলেন যে, শব্দটা তাঁহার কানে গেল না, না অভয়পদ ঘুঙুরটা খুলিয়া রাখিয়াছে? কেন, খুলিতে গেল কেন? বোধ হয় তাহার পড়াশুনার ব্যাঘাত জন্মায়। ব্যাঘাত আর উহাতে কতটুকু হইবে? তবু, যখন খুলিয়া দিয়াছেই, তখন না হয় আপাতত থাক্‌, পরীক্ষাটা হইয়া গেলে আবার পরাইয়া দিলেই চলিবে। দেখ ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক মেথড জিনিসটাই এই রকম। ওই অভয়পদর মন বই-কেতাব হইতে কি রকম উঠিয়া গিয়াছিল, আর আজ বই আর নিজের মাঝখানে একটা ঘুঙুরের মিহি আওয়াজও আসিতে দিতে সে রাজি নয়।

এই সময় কুকুরটাকে সেই রকম হন্তদন্ত হইয়া ওদিক হইতে নীচের দিকে চলিয়া যাইতে দেখা গেল। গলায় নজর পড়িতেই দেখিলেন, না, ঘুঙুর তো ঠিকই রহিয়াছে।

শিস দিয়া ডাকিতে জিমি বারান্দাতেই দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যস্ততার মধ্যে প্রভুর মন রাখিবার জন্য সমস্ত শরীরটাকে দশ-বারো সেকেণ্ড খুব একচোট নাড়া দিয়া সাঁ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শ্যামাপদ বলিলেন, বাঃ রে! আর এত ব্যস্তই বা কেন?

ধলু উপরে আসিয়াছিল, ডাকিয়া বলিলেন, দেখ তো, কুকুরটার গলার ঘুঙুরের মটরটা বুঝি কি ক'রে আটকে গেছে, বাজছে না; ধ'রে ঠিক ক'রে দাও তো।

আবার লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ধলু খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই, তাকে তো বাড়িতে দেখতেই পেলাম না।

ঘুঙুর থাকলে এও একটা সুবিধে, সহজে স্পট করতে পারা যায়। তোমার কাকার পড়বার ঘর দেখেছ? বোধ হয়—

এমন সময় জিমি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে আসিল। সেই ব্যস্তবাগীশ ভাব। শ্যামাপদ বলিলেন, ধর তো, আবার ডাকলে আসে না, আ মর! দেখ তো কি হয়েছে ঘুঙুরটাতে।

জিমি ধরা দিতে কিছু আপত্তি করিল, ঘুঙুর স্পর্শ করিতে দিতে আরও আপত্তি করিল। মটর আটকানো নয়, ঘুঙুরের মধ্যে কি একটা সেঁদিয়া গিয়াছে। এমনই বাহির করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ধলু শেষে ঘুঙুরটাই ব্যাণ্ড হইতে বাহির করিয়া লইল।

ভিতরে আধময়লা একটা কি, ন্যাকড়া বলিয়া যেন বোধ হয়। বাহির করা মুশকিল। নিব দিয়া টানিয়া বাহির করা গেল না। ধলু বলিল, দাঁড়াও, কাকীমার কাছ থেকে মাথার কাঁটা নিয়ে আসি।— বলিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামাপদ চেষ্টা করিতে করিতে একটা কোণ ধরিলেন, তাহার পর অতি সন্তর্পণে সমস্তটাই টানিয়া বাহির করিলেন, মিহি পার্চমেণ্ট কাগজের ভাঁজ করা ছোট্ট একটি বাণ্ডিল। ভাবিলেন, ব্যাপারখানা কি!

আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলিয়া দেখা গেল, একটা চিঠি—বেশ দীর্ঘ চিঠি। কাগজটা দীর্ঘ নয় বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা মাল-মসলায় আগা-পাস্তলা ঠাসা। শ্যামাপদ চশমাটা ভাল করিয়া নাকে বসাইয়া প্রথমেই 'প্রিয়ত—' পর্যন্ত পড়িয়াই অর্ধপথে থামিয়া গিয়া ছি-ছি করিয়া সামলাইয়া লইলেন। তাহার পর ওটুকু বাদ দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন।—

মধুমাখা চিঠি পেলাম। আর যে পারি না—পারি না—পারি না। পড়ার বন্দীশালায়, পুস্তক-প্রহরীর মধ্যে আমি বন্দী—ইন্স্‌ট্রুমেণ্টগুলো যেন তাদের নির্মম অস্ত্র। প্রিয়ে, কি অপরাধে দাদা আমায় এ রকম ক'রে স্বাধিকারপ্রমত্ত করলেন? আমি তো বেশ ছিলাম, কই, আমি তো তাঁর কাছে তোমানিধি চাই নি; দাদাবিধি যদি দিলেনই তো এমন ক'রে বঞ্চিত করলেন কেন? কি সে আমার দোষ? বোধ হয় আমার ভাল করাই তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু ওগো আমার অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, তোমায় এই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেই কি তিনি ভাল করার—

ধলু আসিয়া নালিশের সুরে বলিল, বাবা, কাকীমা কোনমতেই মাথার কাঁটা কি একটা সেফ্‌টিপিন দিলেন না। কি যে জিদে লোক!

শ্যামাপদ কাগজটা মুঠার মধ্যে মুড়িয়া লইয়া অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিলেন, কেন দিলেন না? সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তা হোক, তোমার মাকে শিগগির একবার ডেকে দাও দিকিনি।

তাহার পর হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, আর দেখ, ওই কুকুরটাকে সে—ই ওদিককার রেলিঙে ভাল ক'রে ডবল চেন দিয়ে বেঁধে রেখে এস; যেন এদিক না মাড়াতে পারে। তাই তো বলি, এদিক চায় না ওদিক চায় না, দুদিন থেকে খালি ওপর আর নীচে, করে কি? পাজি মেঘদূত হয়েছেন, মেঘদূত! বার করছি তোমার মেঘদূত হওয়া আমি।

ননীচোরা

১

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সৃষ্টির পাট, একটু যদি নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে ; তাহার উপর ওই দজ্জাল ছেলে সামলানো। ভোরে উঠিয়া বাসী কাজ সারা, তাহার পর স্নান সারিয়া পূজার বাসন মাজা, পূজার ঘর নিকানো—এই দুই প্রস্থ হইয়া গিয়াছে, এখন তিন নম্বর আরম্ভ হইয়াছে এই রান্নাঘরে। স্বামীর নয়টায় গাড়ি, দেবরের দশটায় স্কুল। আমিষের ল্যাঠা চুকিলে শাশুড়ীর হবিষ্য রান্না। মাথার ঠিক থাকে না।

কাকা-ভাইপোতে দাপাদাপি করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিল। কাকা কুঁজো হইয়া অত জোরে দৌড়াইয়াও ভাইপোকে কোনমতেই ছুঁইতে পারিল না ; যদিও ভাইপো এরই মধ্যে তিন-তিন বার আছাড় খাইয়াছে এবং প্রচণ্ড হাসিতে তাহার নিজের গতিবেগটাও নিশ্চয় ব্যাহত হইয়াছে।

উঠানের মাঝখানে এক লাফে পলাতকের সামনে আসিয়া দুই হাতের আড়াল দিয়া বলিল, কি দৌড়ুস রে খোকা! কিন্তু এইবার ?

জেতার চেয়ে হারার এই নূতনতর কৌতুকে খোকার হাসিটা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

আবার কাল দু পয়সা লেট-ফাইন হয়েছে, এই ছ পয়সা হ'ল ; দিও বউদি।

বউদির মস্তবড় মহাল রয়েছে, নিলেম ক'রে নিও।—বলিয়া হাসিয়া কড়ায় খুন্তির একটা ঘা দিয়া বধূ ফিরিয়া বসিল।

সে জানি না, দাদাকে ব'লো।—বলিয়া দেবর হাসিয়া চলিয়া গেল। বধূর ননদের কথা মনে পড়ে। সে দেবরের চেয়েও বয়সে ছোট; কিন্তু এই জায়গাটিতে ঠিক কুটুস করিয়া একটি কামড় দিয়া বসিত। আহা বেটাছেলে, বড্ড নিরীহ জাত!

মা, মুনা।—বলিয়া খোকা আসিয়া পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ওই ওর রীতি।

সর্ খোকা, আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই, শুনলি তো কাকার তাগাদা?

উঁ, থুনলি।—বলিয়া খোকা আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া ঝাঁকড়া মাথাটা মার উরু আর বাহুর মাঝখান দিয়া বুকে গুঁজিয়া স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া গেল। মা একটু স্থির হইয়া দিল খানিকটা স্তন্য, তাহার পর তরকারি নামাইবার মত হওয়ায় খোকার মাথাটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হয়েছে, যা এবার; ক্রমাগত দামালপানা করবি, খিদে পাবে ছুটে আসবি, আমি কাঁহাতক ব'সে ব'সে তোকে মাই দিই খোকা? ছাড়, যাও তো সোনা আমার। যা, একজন এবার নাইতে যাবে, যা দিকিন, গামছা কাপড় দিগে।

ছেলে মার পিঠের উপর লতাইয়া বাঁ হাতে মুখটা ঘুরাইয়া নিজের মুখের অত্যন্ত কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বাবা অঙ্গা অঙ্গা মা?

এত কাজের ভিড়েও অত কাছে রাঙা ঠোঁট দুইটি পাওয়া গেলে মুহূর্তের জন্য সব ভুলাইয়া দেয়। একটা চুম্বন দিয়া মা বলিল, হ্যাঁ, গঙ্গা গঙ্গা করবে যাও।

তরকারি নামাইতে ঢালিতে, কড়া চাঁছিয়া আবার চড়াইতে একটু দেরি হইয়া যায়। কড়ায় তেল দিবার জন্য পিছন দিকে তেলের বাটি লইতে গিয়া দেখিল, সেটা ছেলের দখলে; হাত দুইটি তেলে চোবানো,

পেটটি তেলে চকচক করিতেছে, নীচে একরাশ তেলের ছড়াছড়ি। মার পানে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল, অঙ্গা অঙ্গা।

রোষে বিরক্তিতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া মা বলিল, ও মা গো! এ কি করেছিস খোকা? না বাপু, আমি আর পারি না এই হতভাগা ছেলেকে নিয়ে, কোন্ দিক সামলাই বল তো?

চড় উঁচাইয়া ধমকাইয়া বলিল, দোব ওই ওরই ওপর দু ঘা কষিয়ে, ভিরকুটি ঘুচিয়ে?

খোকা তৈলাক্ত হাত দুইটি পেটের উপর জড়সড় করিয়া অপ্রতিভ-ভাবে মার কড়া চোখের উপর চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সে একটা মস্ত শ্লাঘনীয় কার্য করিতেছে, মা দেখিয়া তাহার বাহাদুরিতে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে, এ ধরনের সম্ভাষণ মোটেই আশঙ্কা করে নাই। একবার উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, লাঞ্ছনাটা আর কাহারও নজরে পড়িল কি না। তাহার পর মার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার ঠোঁটটা একটু উলটাইয়া গেল। একবার দুই গালের একটা শিরা একটু কুঁচকাইয়া সামলাইয়া গেল; ভ্রূজোড়াটি দুই-তিন বার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

এসব রঙবেরঙের বিদ্যুৎস্ফুরণ বর্ষণের পূর্বলক্ষণ, মার জানা আছে। খোকার চোখের জল, সেটা দেখিতেও কষ্ট, সামলাইতেও কষ্ট, তাহা ছাড়া শাশুড়ীর গঞ্জনা, সে তো আছেই। মা হঠাৎ মুখের ভাব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিল, ওরে খোকন, না না, তোকে বলি নি; তোমায় কি বলতে পারি বাবা! আমি যে তেলকে বলছিলাম, হতভাগা তেল, আমার যাদুর পেটে উঠে কি করেছিস বল্ তো?—ওরে খোকা, কি চমৎকার পাখি দেখ্, তুই নিবি? ও মা!

খোকা টালটা সামলাইয়া লইয়াছে, অর্থাৎ চোখের জল ছলছল

করিতেছে বটে, কিন্তু উছলিয়া পড়িতে পায় নাই। মায় পাশে ঠেস দিয়া ধরা গলায় বলিল, আঙা পাখি।

শান্তিদূতের মত সামনের নিমগাছটায় একটা পাখি এইমাত্র আসিয়া বসিয়াছে। রঙটা রাঙা মোটেই নয়; খানিকটা মিশ-কালো, খানিকটা বাসন্তী-হলদে। দুই-এক বার গলা দুলাইয়া একটা হ্রস্ব তরল আওয়াজ করিল।

বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে ছেলেকে মর্যাদা দিয়া মা বলিল, হ্যাঁ, আঙা পাখি; নিবি খোকা? তা হ'লে যা তোর কাকার কাছে, যা দিকিন। আয়, তেলটা একটু চারিয়ে দিই। হয়েছে, এইবার যাও।

খোকা অত্যন্ত ভাল ছেলে হইয়া গিয়াছে। একটু কুঁজো হইয়া, ছড়ানো বাসন-পত্র বাটনা-কুটনার মধ্যে খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, যেন কত বয়স, কত সাবধানী, লোকসানের কত ভয়! তাহার হঠাৎ ভাব-পরিবর্তন দেখিয়া মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কয়েক পা গেলে বলিল, ওরে খোকা, চুমো দিয়ে গেলি নি? মা যে ম'রে যাবে তা হ'লে।

খোকা ফিরিয়া আসিল, চুমা খাওয়া হইল, আবার বুড়ার চালে গন্তব্য পথে চলিল। মা একবার দেখিয়া লইয়া ঘুরিয়া বসিল, কড়ায় তেল দিতে দিতে বলিল, যাও, কাকাকে বলগে। বল, কাকা, রাঙা পাখিটা—

পাখিটা মাঝখানের শব্দটায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিল, গেরস্তর খোক্কা হোক।

কি বলে পাখি সেই জানে; কিন্তু এই সূত্রে মানুষের সঙ্গে তাহার একটা গাঢ় আত্মীয়তা আছে। ঘরে ঘরে তাহার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর, কথা-কাটাকাটি চলে। বধূ তপ্ত তৈলে একটা লঙ্কা ছিঁড়িয়া দিয়া

বলিল, আর খোকার প্রার্থনায় কাজ নেই বাপু, ঢের হয়েছে; একটি সামলাতেই মানুষের প্রাণান্ত—

ওমা! অমন কথা ব'লো, না বউমা; ওই একটিতে ঢের হয়েছে? পাখির মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, কোলে-পিঠে জায়গা না থাক্, ঘর আমার ভ'রে উঠুক দিন দিন।

শাশুড়ী যে ইহার মধ্যে কখন গঙ্গাস্নান সারিয়া পূজার ঘরের রকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বধূ সেটা কাজের ভিড়ে, বিশেষ করিয়া ছেলের দৌরাত্ম্যে জানিতে পারে নাই। হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, পরনে গরদ। বধূ একটু লজ্জিতা হইয়া পড়িল; একটু থামিয়া বলিল, দেখ না এসে কাণ্ডটা মা, এক বাটি তেল ফেলে নৈরেকার করেছে। অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম, নাইতে যাচ্ছে—

স্বামীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার লজ্জিতা হইয়া থামিয়া গেল।

ফেলুক, দৌরাত্ম্যির বয়েস এখন, সইতে হবে। হীরে থির থাকলে আলো ঠিকরোয় না বউমা, চারটে মাস ছিল না, বাড়ি যেন—ও বউমা, শিগগির দৌড়োও, খেলে আমার মাথা।

খোকা ঠাকুরমার গলা শুনিয়া পাখির কথা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে; বধূর প্রতি উপদেশ শেষ করিবার পূর্বেই দুলিতে দুলিতে তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিল। তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া বিপর্যস্তভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, স'রে যাও দাদু, আমায় ছুঁয়ো না—কি গেরো! ও বউমা, ওরে, তোর গায়ে রাজ্যির অনাচার দাদা, আমায় ছুঁস নি, দোহাই তোর—ও বউমা, তুমি বুঝি তামাশা দেখছ? অ দাদু, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার—

বউমা লজ্জার ঝাঁজের অছিলায় মুখে কাপড় দিয়া তামাশাই দেখিতেছিল। খোকা মস্ত একটা কৌতুক পাইয়া গিয়াছে; যতই না

এড়াইবার চেষ্টা, সে ততই দুই হাত তুলিয়া ঠাকুরমাকে ছুঁইবার জন্য ছুটিয়াছে ; হাসির চোটে সারা মুখটা সিন্দুরবর্ণ। ষাট বছরের বৃদ্ধা, নাতির সমবয়সী হইয়া সমস্ত রকটা ছুটাছুটি করিতেছেন আর চেঁচাইতেছেন, অ দাদু, খাস নি মাথা আমার, আবার নাওয়াস নি বুড়ীকে—ও বউমা, শিগগির এস বাছা সব ছেড়ে—

বউমা গরম তেলে তরকারি ছাড়িয়া তাড়াতাড়ির ভান করিয়া ধীরেসুস্থে হাত দুইটা ধুইয়া উঠিল। শাশুড়ী বুঝুন, উপদেশ দিলেই হয় না। ঠোঁটে কোথায় যেন একটু হাসি লাগিয়া আছে, পা চালাইয়া আসিয়া খোকাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, এই রকম দাম্পাণ্ডা দিয়ে ঘর ভ'রে উঠলেই তো—

কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই দুষ্টামির হাসি সজোরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঢাকা দিবার জন্য খোকাকে বলিল, ঠাকুরমাকে ছুঁতে নেই এখন।

খোকা মার মুখের কাছে মুখ আনিয়া, ঘৃণায় নাকটা একটু কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, ঠাম্মা, অ্যা ছিঃ, মা ?

ঠাকুরমা হাসিয়া রাগিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ঠাম্মা হ'ল অ্যা ছিঃ, আর তুমি ভারি পবিত্তির, নবদ্বীপের পণ্ডিত। আমার রীতিমত হাঁপ ধরিয়ে দিয়েছে গো। কুশাসনটা বার ক'রে দাও তো মা, একটু ব'সে জিরিয়ে নিই, আর পেরেক থেকে মালাটাও নামিয়ে দিও। ওইঃ, একা হন না, আবার জুড়িদার এল। সর সর, পড়ল বুঝি ঘাড়ে।

২

হাঁ্যা করিয়া ছোট্ট একটি আওয়াজ করিয়া তিন-চারি দিবসের একটি বাছুর সদর-দরজায় প্রবেশ করিল, এবং সমস্ত উঠানটা হুড়হুড় করিয়া

ছুটিয়া সামনে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকা উল্লসিত আবেগে 'গোউ গোউ' বলিয়া করতালি দিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত পা সোজা করিয়া দিয়া মার কোল হইতে নামিয়া ছুটিল।

ঠাকুরমা কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন, ঘাড়ে-টাড়ে পড়বে না তো বাপু? দেখো।

না, ও নিজেই বাঁচিয়ে পালায়। যাই, বাবাঃ!—বলিয়া একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ হেঁসেলে চলিয়া গেল।

একটার পর একটা চলিতেছেই, শ্রান্তি নাই, বিরামও নাই। এবার বাছুরের সঙ্গে চলিল। হাতে একটা ছোট শুষ্ক আমের ডাল তুলিয়া লইয়াছে, বাছুরটাকে ছোঁয় ছোঁয়, সে উঠানময় দুই-একটা চক্র দিয়া আবার দূরে দাঁড়াইয়া পড়ে। খোকা হাসিয়া লুটাইয়া যায়, উঠে, আবার ছুটে। সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত; কপাল, বক্ষ আর কাঁধের ধূলা ঘামের সঙ্গে কাদা হইয়া কণায় কণায় জমিয়া উঠিয়াছে, হাসির চোটে মুখে লালা উঠিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, গলার হারটা কখনও বুকে, কখনও পিঠে। মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলার দুর্দশার আর পরিসীমা নাই।

দেখাও যায় না, অথচ এই অশেষবিধ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে খোকা যে কেমন ভাবে কি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে চোখ ফিরাইয়া রাখাও যায় না।

মা আড়চোখে দেখে, হাসে। তরকারি নাড়িতে গিয়া খুন্তিটা এক-এক বার কড়ার বাহিরে শূন্যে ওলট-পালট খায়।

ঠাকুরমার মালা অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, জপের সঙ্গে যে তাহার একটা যোগ আছে, তাহা বোধ হয় না; কেন না, হিসাব রাখার মালিক যে মন, সে উঠানে। খোকা সেখানে তাহাকে ধূলার মধ্যে, তাহার অকাজের মধ্যে, তাহার বিসদৃশ সাথীর মধ্যে, এক কথায় তাহার শত রকম বেহিসাবের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে।

এ মোহ, এরূপ ভ্রান্তি হইবারই কথা। এই পরিবারের গৃহদেবতা গোপাল। ভগবান এখানে সম্ভ্রমের অধিকারী নন, স্নেহের ভিখারী। তিনি বিরাট নন; তিনি অপ্রমেয় অজ্ঞেয় নন; তিনি নন্দের দুলাল, যশোদার নয়নমণি, তাঁহার সম্বন্ধে ওসব কথা আর আসে কোথা হইতে? তিনি প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের, সংসারের হাসি-অশ্রু দিয়া গড়া। যশোদা তাহাকে তাড়নাও করে, আবার নধর অধরে ক্ষীর সর ননী দেয়, চাঁদমুখ মুছাইয়া ললাটে তিলক আঁকে, মাথায় শিখিপাখা, শ্যামদেহে পীতধড়া, হাতে পাচনি দিয়া ধেনুদলের সঙ্গে গোচারণে পাঠাইয়া দেয়। গোপাল যখন যায়, যতক্ষণ দেখা যায়, মায়ের চির-অতৃপ্ত নয়ন লইয়া চাহিয়া থাকে; আবার সন্ধ্যার গোধূলিক্ষণে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়ায়, এখনই গোপাল মলিন মুখে মলিন বেশে আসিয়া মায়ের বক্ষলগ্ন হইবে।

সে সুদূর নয়, শিশুরা তাহাকে সবার ঘরে ঘরে আনিয়া দেয়, নিয়তই। খোকার মুখে কি তাহারই ছায়া পড়িয়াছে? ধূলি-পাটল পেলব অঙ্গে কি তাহারই বর্ণাভাস? কচি পায়ের চঞ্চলতায় কি তাহারই নৃত্যবিলাস?

ঠাকুরমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে অশ্রু। ঝাপসা দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য এক-এক বার মনে হয়, যেন গোপাল নিজেই,—ছায়া নয়, আভাস নয়। শ্যামদেহ ঘিরিয়া পীতবাস, মাথায় মোহনচূড়া বিস্রস্ত, হাতে পাচনবাড়ি, কপালের চন্দন কাদার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমার অঙ্গ আলোড়িত করিয়া যশোদার স্নেহ নামে; আহা, অসহায় শিশু, খেলায় অসহায়, শ্রান্তিতে অসহায়; কি যে করে, কি না করে, নিজেই জানে না। ও আবার দেবতা কবে হইল?

যশোদা ঘরে ঘরে নিজের শিশুকে বিলাইয়া, মায়ের ব্যাকুলতা লইয়া সবার বুকে আসিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরমা বলে, ওরে অ খোকা, ঘেমে নেয়ে গেলি যে! দেখ তো ছিষ্টিছাড়া খেলা ছেলের!

ওদিকে ধবলী 'ম্বা' করিয়া আওয়াজ করে ; চারিদিকে বিপদ-আপদ ঢের, অবুঝ বৎস, সে চোখের আড়ালে কেন যে যায় !

কিন্তু খেলা তবুও চলিতে থাকে।

অবশেষে বোধ হয় শ্রান্তি একটু আসিল। খোকা অবশ্য বাহ্যত সেটা স্বীকার করিল না। উঠানে বসিয়া হাসিতে হাসিতে ঘাড় এলাইয়া একবার মার দিকে চাহিল, একবার ঠাকুরমার দিকে চাহিল। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে হইল, খুব সহজ ব্যাপার, অথচ খুব মজা হয় তাহা হইলে। রকের উপর উঠিয়া গিয়া, আমের ডালটা দুই হাতে পিছনে ধরিয়া, ঘাড় দুলাইয়া প্রশ্ন করিল, ঠাম্মা, খেব্বি ?

ঠাকুরমা হাসিয়া উদ্বেলিত অশ্রু মোচন করিয়া বলিল, হ্যাঁ ভাই, খেলব, ডেকে নে, অনেক হয়েছে।

দেরি হইয়া যাইতেছে, উঠিয়া সজল নয়নে পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সেদিন এই পরিবারের ক্ষুদ্র ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটিল।

ঠিক পূজা সেদিন হইল না, যেন একটি দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল শিশুর পরিচর্যায় কাটিয়া গেল, তাহার চঞ্চলতা আর প্রতিকূলতার জন্য পদে পদেই বাধা। বৃদ্ধা গোপালের সাজগোজ একটি একটি করিয়া খুলিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া আবার অতি সন্তর্পণে, প্রাণের দরদ দিয়া পরাইয়া দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে নানা রকম আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ—এইবার এই রকম ক'রে দাঁড়াও তো ঠাকুর, পীতধড়াটা এঁটে দিই। এই বাঁশী ধর। কতদিন থেকে ইচ্ছে, একটি সোনার বাঁশী গড়িয়ে দিই ; সে সাধ আর গোপাল মেটাবে না ? আর কবেই যে মেটাবে ?

যেন প্রত্যক্ষ গোপালের সামনে কথাটা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

সারাদেহে ধূলি, বদনে স্বেদবিন্দু কল্পনা করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দেন। মুখে অনুযোগ, জগতের ভাবনা ভেবেই তুমি সারা হ'লে, নিজের দিকে আর দেখবে কখন ?

হিন্দুর মন, পুতুল খেলার পাশে পাশে গীতার ধ্বনি উঠে। অলকা-তিলকা দিয়া শৃঙ্গার শেষ হয়। তখন আবার নিজের প্রগল্‌ভতায় হাসি পায়। হে ঠাকুর, আমার অহমিকা নিয়ে তোমার এ খেলার মর্ম তুমিই বোঝ। আমি আবার তোমায় সাজাব, মোছাব। যেমন তোমার যশোদার ছেলে হওয়া, তেমনই আমার সেবা নেওয়া ; তোমার লীলার অন্ত আমি আর কি পাব ঠাকুর ?

শৃঙ্গারের সময় দেবতা বিগ্রহের মূর্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; কিন্তু পূজার সময় তাঁহাকে পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। আজ খোকার খেলার পথে আসিয়া তিনি যেন অতিমাত্র চঞ্চল। চিত্তের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়াও তাঁহাকে পূজার আসনে ধরিয়া রাখা যায় না। আজ তিনি ধ্যানাতীত। কখনও বায়ুর মত স্পর্শের অগোচর, সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অথচ আকারে ধরা যায় না। কখনও তিনি নাই, একেবারেই বিলুপ্ত, শুধু শিশুতে শিশুতে সমস্ত বিশ্ব একাকার হইয়া যায়। মায়ের নত দৃষ্টির নীচে শিশুর হাসি, ছায়াশ্যাম বৃক্ষতলে খেলায় মত্ত শিশুর দল, কোথাও দরিদ্রপল্লীতে জীর্ণ গৃহ, অবসরহীন জননী, উঠানে ছিন্নবাস-পরা শিশু-ভগ্নীর কোলে রুগ্ন শিশু, অশ্রুভরা নিষ্প্রভ তাহার চোখ, কোথাও শিশুর দুর্জয় অভিমান, চাপা ঠোঁট, শান্ত গম্ভীর ভাব, মা খাবার খেলনা রাজ্যের যত জিনিস একত্র করিয়াও মন পায় না, এক-এক সময় সব মুছিয়া এক অপূর্ব দৃশ্য ভাসিয়া উঠে, নবদূর্বাদলশ্যাম নবনীতদেহ এক শিশু, মাথায় চিক্কণ কেশের চূড়া বায়ুভরে দোদুল, পীতবাস-পরা বঙ্কিম কটি, যমুনাকূলের বেণুবন তাহার চঞ্চল নৃত্যপর

রাঙা চরণের ঘায়ে তৃণগুচ্ছে রোমাঞ্চিত, কখনও সে ধেনুর গায়ে লুটাইয়া পড়ে, কখনও নাচিতে নাচিতে বংশীধ্বনি করে, তাহার বাঁশীর স্বরে আকাশ বাতাস ভরিয়া যায়, বনপ্রান্তর পুষ্পে পুষ্পে মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, যমুনার কালো জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলোর খেলা চলে।

দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া গেল। যশোদার গৃহ, ঘরের মেঝেয় ভাঙা ননীর পাত্র। গোপালের মুখে হাতে যেখানে সেখানে চুরি করা ননীর পোঁচ, শ্যাম ননীর দেহখানি স্নিগ্ধ সাদা ছোপে ছোপে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রাণী আর পারে না, নিত্যই এই চৌর্যবৃত্তি, এই অপচয়; শাসন মানে না, এমন বিড়ম্বনার শিশুকে লইয়া করা যায় কি? তোকে এবারে না বাঁধলে চলছে না গোপাল, র'স্ তুই, দড়ি নিয়ে আসি। গোপালের কাতর দৃষ্টি, অনুনয় করিতে করিতে ক্ষুদ্র দেহখানি ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, মা গো, আর হবে না, এই শেষ; তোর বাঁধন যে বড় কঠিন হয় মা।

আহা, শিশুর অদম্য লোভ, কিই বা করে সে?

পূজার সম্ভার পড়িয়া থাকে, মন্ত্র অনুচ্চারিত। মুদিত চোখের পক্ষ্ম ভিজাইয়া শুধু অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়ে। হে শ্যামসুন্দর, এস, তোমার শিশু-মনের সমস্ত লোভ, তোমার সেই পরম করুণা নিয়ে এস। এখানে তোমার পায়ে সমস্ত উজাড় ক'রে দোব ব'লে ব'সে আছি, অথচ তুমি বিমুখ; হোথায় যশোদার কি পুণ্যবলে তাঁর সমস্ত লাঞ্ছনা অঙ্গের ভূষণ ব'লে মেনে নিচ্ছ ঠাকুর?

অনেকক্ষণ এই রকম যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে মনটা আচ্ছন্ন থাকে, হঠাৎ ছেলের বকাবকিতে চৈতন্য হয়, আবার আজ ভাতের দেরি ক'রে ফেললে? না, চাকরিটা না খেয়ে আর—

বধূর চাপা গলায় উত্তর, কি করব, যা দজ্জাল ছেলে হয়েছে! একটিবার যে কাছে ডেকে উবগার করবে—

ও! মনিব-ঠাকরুণের ছেলে না আগলালে বুঝি একমুঠো ভাত—

আরও চাপা গলায় প্রত্যুত্তর হয়, আঃ, চুপ কর, পূজোর ঘরে মা।

আবিষ্ট ভাবটা কাটিলে বৃদ্ধা নিজের মনেই বলিলেন, আজ তুমি তো ঠিক ধ্যানের রূপে দেখা দিলে না ঠাকুর, কেন, তা তুমিই জান।

পুষ্পরাশি চন্দনে মাখাইয়া বেদীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর কুশিতে জল লইয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিতে যাইতেই 'এ কি হ'ল!' বলিয়া যেন চিত্রার্পিতের মত কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হইয়া গেলেন।

চোখের জলে এখনও দৃষ্টিটা একটু ঝাপসা রহিয়াছে, অঞ্চল দিয়া মুছিলেন। না, ঠিকই তো, রেকাবির মাঝখানের নৈবেদ্যের চূড়ার উপর বড় যে ক্ষীরের নাড়ুটি—সবচেয়ে যেটি বড়—সেইটি নাই! এইমাত্র নিজের হাতের রচনা করা নৈবেদ্য, ওই নাড়ুটি একবার পড়িয়া গিয়াছিল, ভাল করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়, ভুলের তো কোন সম্ভাবনাই নাই!

তবুও নিজের অদৃষ্টকে বিশ্বাস হয় না, আবার ভাল করিয়া চোখ মুছিতে যান। কম্পিত হস্তে চোখে অঞ্চল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এক অননুভূতপূর্ব ভাবের উচ্ছ্বাসে অভিভূত করিয়া ফেলে। শরীর কণ্টকিত, মনে হয়, যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙিয়া সমস্ত শরীরের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে। চক্ষের জল মুছিবে কে? কূল ছাপাইয়া বন্যা নামিয়াছে।

মুখে একটি মাত্র কথা, আনন্দ-ব্যাকুল একটি মাত্র বিস্মিত প্রশ্ন, হে ঠাকুর, এ কি দেখালে?

৩

যখন বাহির হইয়া আসিলেন, চোখের পল্লব সিক্ত, মুখে একটি শান্ত জ্যোতি। বধূর বড় আশ্চর্য বোধ হইল, একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, মা, আজ তোমার এত দেরি হ'ল?

বউমা, একবার পূজোর ঘরে এস।

ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘুরিয়া বলিলেন, রান্নাঘরের কাপড়টা ছেড়ে এস বউমা।

বধূ কাপড় ছাড়িয়া আসিলে ভিতরে গিয়া বলিলেন, এই দেখ বউমা, আমি নিজের হাতে বড় নাড়ুটি মাঝখানে বসিয়েছিলাম, চোখ মেলে দেখি, নেই।

শাশুড়ীর মুখের আলো যেন বধূর মুখমণ্ডলে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল, সে চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব, এ বাড়ির মাটির প্রতি কণাটি পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের রসে সিক্ত, বিশ্বাস এদের কোনখানে কখনও বাধা পায় না। গোপালের এ গৃহে পদার্পণই অলৌকিকত্বের মধ্য দিয়া। তাহার পর এই পরিবারের সঙ্গে তাহার লীলার লুকাচুরি চলিয়া আসিতেছে, বিশেষ করিয়া পূর্বজদের আমলে। তাহার মধ্যে কত ঘটনা ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কত আজ পর্যন্ত সংশয়ের আলো-ছায়ায় দুলিতেছে, কত বা একেবারেই নিসংশয়িত ধ্রুব সত্য—জীবনের চেয়েও সত্য, গোপালের বিগ্রহের মতই সত্য।

শাশুড়ী বলিলেন, এ সেই যাঁর নাম করতে পারি না, গোঁসাইয়ের বংশ বউমা, এ রকম ব্যাপার তো এ বাড়িতে নতুন নয়; তবে আজকাল আর আমাদের পুণ্যির জোর নেই এই যা। পূজো সেরে শ্বশুর ভাগবত পড়তেন, খুব তন্ময় হয়ে পড়তেন কিনা, তেমনই সুকণ্ঠও ছিল, একটি বছর তিনেকের শ্যামবর্ণ ছোট ছেলে এসে বসল, একখানি হলদে রঙে ছোপানো কাপড়, কোমর থেকে খ'সে গেছে, জড়িয়ে-সড়িয়ে কাঁধে পুঁটুলি ক'রে নিয়েছে। বসল তো বসল, শ্বশুর একবার দেখে আবার নিজের মনেই প'ড়ে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে আর একবার

একটু অন্যমনস্ক হতে গিয়ে ছেলেটির ওপর একটু নজর পড়ল, ঠায় এক-ভাবে ব'সে আছে। পাঠ শেষ করতে আরও অনেকক্ষণ গেল। বই মুড়ে চোখ তুলে দেখলেন, ছেলেটি নেই, কখন উঠে গেছে। আহা, ছোট্ট ছেলেটি, হুড়োহুড়ি ক'রে হাক্লান্ত হয়ে ব'সে ছিল, একটু নৈবিদ্যি হাতে দিই। এই ভেবে তিনি রেকাবি থেকে ক্ষীরের নাড়ুতে ফলেতে মুঠোটি ভ'রে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগা, যে ছোট ছেলেটি আমার ঘরে গিয়ে এতক্ষণ ব'সে ছিল, কোথায় গেল, দেখেছ?

সকলেই বলিল, কই না, দেখি নি তো।

শ্বশুর বললেন, সে কি! এই যে এতক্ষণ ব'সে ছিল আমার কাছে—ন্যাংটো, কাঁধে একখানা হলদে কাপড়, ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দুটি!

শাশুড়ী একটু খিটখিটে ছিলেন, ধমক দিয়ে বললেন, জালিও না বাপু; একবাড়ির লোক গিজগিজ করছে, ছোট ছেলে একটা এল, রইল, বেরিয়ে গেল, কাকে কোকিলে জানতে পারলে না! বউমা, ওঁর মিছরির পানাটা নিয়ে এস; রাজ্যির বেলা করবেন, না নিজের মাথার ঠিক থাকবে, না অন্যের মাথা ঠিক থাকতে দেবেন।

কে আর মিছরির পানা খাবে? সেই নৈবিদ্যির ফল নাড়ু হাতে ক'রে সমস্ত পাড়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ালেন, হ্যাঁগা, এ রকম একটি ছেলে, হলদে কাপড় কাঁধে, তোমাদের বাড়ির ছেলে কি? দেখেছ কি? কিন্তু কে দেখবে? সে কি কারুর বাড়ির ছেলে যে, লোকে দেখবে তাকে?

শাশুড়ী একটু থামিলেন। দুইজনের চোখই জলে ভাসিয়া যাইতেছে। আবার বলিতে লাগিলেন, তখন এসে, সেই হাতের নৈবিদ্যি হাতে ক'রে পূজোর ঘরে ঢুকে আসনে শুয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন গেল, সমস্ত রাত গেল, আহার নেই, নিদ্রে নেই। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এসে

স্বপ্ন হ'ল, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলেই কি আমায় পাবি? ওঠ্, তোর নৈবিদ্যি খেয়েছি, ক্ষীরের এক পাশে আমার দাঁতের চিহ্ন দেখতে পাবি। খা, আমার কষ্ট হচ্ছে, উপোসী ক'রে রেখেছিস।

অশ্রু মুছিতে মুছিতে দুইজনে বাহিরের রকে আসিয়া বসিলেন। এই ধরনের গল্প চলিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে গীতা ও ভাগবতের তত্ত্ব-কথা, ভক্তের জন্য তিনি কি ভাবে কত লীলারূপ ধরেন, নিজের মুখে কোথায় কি আশার কথা কবে বলিয়াছেন, সেই সব।

গল্পের মধ্যে শাশুড়ী বলিলেন, এসব কথা কিন্তু কাউকে আর এখন জানিয়ে কাজ নেই বউমা; অবিশ্বাসীর কানে গেলে তিনি কষ্ট পান, কতবার স্বপ্নে বলেছেন, আমার লাঞ্ছনা হয় ওতে।

উঠানের ওদিকে সদর-দরজায় খোকার আবির্ভাব, কে কাপড় পরাইয়া দিয়াছিল, শুধু কোমরের গেরোটি লাগিয়া আছে; বাঁ হাতে কাপড়ের পাড়ে বাঁধা একটা ভাঙা কলাই-করা সানকি, ডান হাতে সেই চিরন্তন লাঠি; সানকির উপর এক ঘা বসাইয়া মার দিকে চাহিয়া বলিল, গোউ—ছোনা!

মা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, নির্বিবাদে মার খাচ্ছে কিনা, সোনা তো হবেই।

খোকা হঠাৎ শান্ত গরু আর শান্ত করা লাঠি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার রেওয়াজ মাফিক বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিল। ঠাকুরমা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, কোথায় গিয়েছিলি ভাই? আজ তোর সাথী তোর সঙ্গে খেলবার জন্যে যে—

খোকার পাঁচ-সাত টানের বেশি গ্রহণ করিবার কোন কালেই ফুরসৎ থাকে না। খেলার নামে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিল, ঠাম্মা, টুই—

এই সময় কাকা আসিয়া বলিল, বউদি, ভাত।

খোকা বোধ হয় ঠাকুরমাকে খেলিবার জন্য উৎসাহিত করিতে যাইতেছিল, সামনে এমন জবর সঙ্গী পাইয়া মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। ছুটিয়া গিয়া চোখে মুখে প্রবল আগ্রহের দীপ্তি ভরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেয়ে, খেব্বি ?

কাকা শখ করিয়া ভাইপোকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছে। পিতাপুত্রে আবার একচোট মাতামাতি চলিল।

আশায় আশায় দিন কাটিতেছে, গোপালের আগমনের কিন্তু কোন নিদর্শনই আর পাওয়া যায় না। নৈবেদ্যের পরিবর্ধিত আয়োজন—শুদ্ধাচারে তৈয়ারি করা, দুইটি অন্তরের ভক্তিরস দিয়া সিঞ্চিত—যেমনকার তেমনই পড়িয়া থাকে। বাটিতে বাটিতে সর ক্ষীর ননী, রেকাবিতে ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নাড়ু, কোনটারই কোনখানে প্রত্যাশিত করচিহ্নটুকু পড়ে না। বধূ উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকে, শাশুড়ী বাহির হইলে মুখে গাঢ় নিরাশার ছায়া দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতেও সাহস করে না।

চারিটি দিন কাটিয়া গেল। হাতে দুইটি নাড়ু লইয়া, রান্নাঘরের রকে আসিয়া শ্রান্তকণ্ঠে শাশুড়ী বলিলেন, নাঃ বউমা, কাল থেকে গয়লা-বউকে ব'লে দিও, যেমন দুধ দিচ্ছিল তেমনই দেবে। মিছে আশা। কই দাদু, পেসাদ খেয়ে যা রে।

বধূ ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, আমাদের কি সে রকম অদৃষ্ট মা ?

খোকার কাকা ঘর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, ও মা, ও হতভাগাকে কিচ্ছু দিও না; আমার সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে, দেখ এসে বরং।

খোকা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল। বুকে পিঠে সর্বাঙ্গে কালি, একটা চড়ের উপর দিয়াই ফাঁড়াটা কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া মুখে হাসি। সিঁড়ি দিয়া রকে উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ক ক।

মা ধমক দিয়া বলিল, খুব ক খ হয়েছে ; তোমার ঠ্যাং খোঁড়া না ক'রে দিলে আর—

ঠাকুরমা বলিলেন, থাক্, হয়েছে, আর বকে না। হাতে নাড়ু দিয়া খোকাকে আলগোছে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন, তোর সাথী আমার পূজোর ঘরে কবে আসবে দাদু, ক্ষীর সর নিয়ে এই রকম দৌরাত্ম্যি করতে ?

খোকা নাড়ু চিবানো বন্ধ করিয়া কথাটা যেন একটু বুঝিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর পুনরায় বার কয়েক মুখ নাড়িয়া, খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া প্রশ্ন করিল, পেছা ঠাম্মা ?

হ্যাঁ ভাই, পেসাদ খেতে সে আর আসবে না ?

খোকা ঠাকুরমার মুখের খুব কাছে মুখটা লইয়া গিয়া, নিজের চোখ দুইটা খুব জোরে একটু বুজিয়া থাকিয়া, আবার খুলিয়া বলিল, ঠাম্মা, এনো কলো।

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, মিছিমিছি চোখ ওরকম করতে যাব কেন রে হনুমান ?

খোকা আর একবার চোখ বুজিয়া ব্যাপারটার পুনরভিনয় করিতে যাইতেছিল, 'ও বুঝেছি' বলিয়া ঠাকুরমা তাহাকে আবেগভরে বুকে চাপিয়া গভীর বিস্ময়ে বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন, বউমা, দেখলে ? আমি বলি তোমাদের, এ আমাদের ছলতে এসেছে।

বধূও বিস্মিত হইয়াছিল, তবে সেটা প্রধানত শাশুড়ীর আচরণে ; নির্বাক হইয়া সপ্রশ্ননেত্রে চাহিয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ওর বলবার ইচ্ছে, একেবারে চোখ বুজে ব'সে থেকো, তা হ'লেই আসবেন। ঠিকই তো বউমা, এখন বেশ মনে পড়ছে কিনা, একটু দেখতে পাব আশা ক'রে এ কটা দিন ধ্যানের সময় ক্রমাগতই চোখ খুলে যাচ্ছে,

তাতে কি আর তিনি আসেন মা? যেদিন আসেন, সেদিন কতক্ষণ যে একঠায় চোখ বুজে ছিলাম, এখন সেসব কথা মনে পড়ছে। তাতে মন স্থস্থির না হ'লে তো হবে না মা, গাছটিকে যদি ক্রমাগতই ওপড়াও, তবে কি গোড়া বসতে পারে? কিন্তু ওই শিশু, নিজের খেলায়ই মত্ত, কি ক'রে জানলে ও?

খোকাকে বুকে মিশাইয়া লইবার মত করিয়া সজল নয়নে প্রশ্ন করিলেন, তোর মনে কি আছে দাদু? বড় যে ভয় করে ভাই!

অমঙ্গল আশঙ্কায় মাও চক্ষে অঞ্চল দিল।

৪

তাহার পরদিন রবিবার ছিল, রান্নাবান্নার তাড়া নাই। বড় ছেলেকে রোজ আটটার সময় আহার করিতে হয় বলিয়া, রবিবার দিন একটার সময় আহারে বসিয়া যুগপৎ নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং চাকরির উপর আক্রোশ মিটায়। শাশুড়ী-বধূতে পরামর্শ হইল, পূজার সময় সেদিন বধূ পর্যন্ত বাড়িতে থাকিবে না, খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে বেড়াইতে যাইবে। ভিতর-বাড়িতে শুধু শাশুড়ী থাকিবেন একা, পূজার ঘরে।

সেদিন রাত্রি থাকিতেই শাশুড়ী-বধূতে উঠিয়া, একান্ত শুচিতার সহিত স্নানাদি সারিয়া পূজার আয়োজন করিলেন। ক্রমে গব্য দ্রব্যের ফুল ও চন্দনের গন্ধে ঘরটি ভরপূর হইয়া উঠিল। একটু বেলা হইলে বড় ছেলে রবিবারের অনিশ্চিত আড্ডায় চলিয়া গেল। ছোট ছেলের ক্যারম-প্রতিযোগিতা সামনে, সে মহলা দিতে গেল। বধূও এদিক-ওদিক একটু পাট সারিয়া খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে চলিয়া গেল। নির্জন নিঃশব্দ বাড়িটিতে শুধু একটি ব্যাকুল ভক্ত সংসারের সহস্র প্রয়োজনে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সাধ্যমত আকৃষ্ট করিয়া, আশায় অবাধ্য নয়নদ্বয়কে প্রতীক্ষায় সংযত করিয়া পূজার আসনে বসিয়া রহিল। শিশুর কথা দেবতারই ইঙ্গিত, খোকা চোখ বুজিতে বলিয়া চোখ খুলিয়া দিয়াছে। অনেকক্ষণ গেল, ক্রমেই শরীর-মন যেন কি

একটা অপার্থিব সুষমায় ভরিয়া আসিতে লাগিল—প্রথম দিনের মতই, ক্রমে প্রথম দিনকেও অতিক্রান্ত করিয়া।

কাকা খোকাকে ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না, বিশেষ করিয়া ছুটির দিন। খেলার মধ্যেই একবার বাড়ি আসিয়া দেখিল, আর কেহ নাই, শুধু খোকা পূজার ঘরের নীচু জানালাটায় পেটটি চাপিয়া গভীর একাগ্রতার সহিত ভিতরে উঁকি মারিতেছে। কাছে যাইতে ডান হাতের কচি মাংসল আঙুল কয়টি জড়ো করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফিসফিস করিয়া বলিল, তুপ, বাবা আবো।

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহার বাবা হওয়ার লোভ দেখাইবার ধরন দেখিয়া কাকার বেজায় হাসি পাইল। ফিস-ফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মা কোথায় ?

খোকা মুঠাটি গালের উপর বসাইয়া, ক্ষুদ্র তর্জনীটি পাশের বাড়ির দিকে নির্দেশ করিয়া একটু কুঁজোর মত হইয়া দাঁড়াইল, কোন কথা বলিল না। তাহার ভঙ্গীর নূতনত্ব আর বিচিত্রতায় কাকার হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইল, পাশের বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া বলিল, বউদি, শিগগির এস ; একটা মজা দেখবে এস তোমার ছেলের।

বউদিদি নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতেছিল, বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, ওমা, তাই তো! কখন চ'লে গেছে সেটা ?

হনহন করিয়া ছুটিল, ছোটদের মধ্যে দুই-একজন সঙ্গও লইল।

খোকা জানালার কাছে নাই। দেবরের সঙ্গে সঙ্গে রকে উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া ভিতরে নজর দিয়াই বধূ বিস্ময়ে আশঙ্কায় নির্বাক হইয়া গেল। শাশুড়ীর মুদিত নয়নযুগলে ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে ; একটু দূরে কালো পাথরের বাটিতে ক্ষীরের মধ্যে হাত ডুবাইয়া খোকা সতর্কভাবে ঠাকুরমার চোখের দিকে চাহিয়া ; পলাইবার উদ্যমে শরীরটা মাটি হইতে একটু উঠিয়া পড়িয়াছে।

জানালা দিয়া ছায়া পড়িতেই ফিরিয়া চাহিয়া দুইটা হাত পেটে জড়ো করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ও মা গো !—বলিয়া বধূ ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। শাশুড়ী হঠাৎ

চক্ষু খুলিয়া আচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বউমা? কিন্তু সঙ্গে সামনের দৃশ্যটিতে নজর পড়ায় আর উত্তরের প্রয়োজন হইল না।

বধূ বলিতে লাগিল, তোমার এই কীর্তি, হতভাগা চোর? আমরা নাগাড়ে ক্ষীর সর মাখন তোয়ের ক'রে ক'রে হয়রান হচ্ছি, আর তোমার ভেতরে ভেতরে এই মতলব? তুমি আমার কাছে না ছুটে যদি ধ'রে নিতে ঠাকুরপো, কি নৈরেকার, কি অনাচারটাই—

আমি কি জানি? ভাবলাম, এর পরে নকল করবে ব'লে জানলা থেকে মার পূজো দেখছে; ওঁর মালাজপের নকল করে, দেখ না? ওর পেটে পেটে যে এ মতলব, তা কেমন ক'রে জানব? সে বুড়ুটে ভাব যদি দেখতে! আবার বলে, বাবা হব, চুপ কর।

হওয়াচ্ছি বাবা। এইজন্যে ঠাকুমাকে কাল পরামর্শ দেওয়া হ'ল, চোখ বুজে থেকো—চেপে। চার দিন থেকে জুত হচ্ছিল না, না?—বলিয়া রাগ না চাপিতে পারিয়া বধূ হাত উঠাইয়া আগাইয়া গেল।

শাশুড়ী এতক্ষণ বিস্মিত হাস্যে খোকার দিকে চাহিয়া এক রকম ধ্যানের ভঙ্গীতেই মৌন হইয়া বসিয়া ছিলেন। বধূ অগ্রসর হইতেই বলিয়া উঠিলেন, খবরদার বউমা। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া খোকাকে কোলে লইয়া আসিয়া আসনে বসিলেন। ক্ষীর মাখানো হাতটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই তাঁর হাত বউমা, এই তাঁর চাঁদমুখ। বউমা, বললে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না, আজ গোপাল এসেছিলেন। ধ্যান করবার সময় মনে হ'ল, যেন ঘর আলো ক'রে এলেন, ক্ষীরের বাটির মধ্যে হাত ডুবুলেন, এমন সময় তোমাদের গলা শুনে জেগে উঠলাম।

খোকার কীর্তি রাষ্ট্র হইয়া গেল। কত মুখে বিদ্রূপের হলাহল উদ্গীরিত হইতে লাগিল। বধূরও ভ্রান্তি ঘুচিল বোধ হয়; কিন্তু একজনের মনে কেমন করিয়া সত্যের একটি শিখা অম্লান আলোয় জ্বলিয়া রহিল। বধূকে আদেশ হইল, কাল থেকে খোকার জন্যে ছোট্ট একটি নৈবিদ্যি আমার আসনের পাশে রাখা থাকবে বউমা, যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে।
